সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

গেন্নাদি বেলভ

রাষ্ট্র কী



প্রগতি প্রকাশন মস্কো

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ·আ·ক·খ

গেন্নাদি বেলভ

রাষ্ট্র কী



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ
গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভোলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবীস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউর্লভ

АВС социально-политических знаний

Г. Белов

ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?

на языке бенгали

G. Belov

ABC of Social and Political Knowledge

WHAT IS THE STATE?

In Bengali

© Progress Publishers • 1986
© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৯

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Б $\frac{0301050000-686}{014(01)-88}$ 239—89

ISBN 5-01-001406-8

Sanjay Bhattacharyya

সূচি-পত্র

ভূমিকা

লোকে দিন কাটায় নির্দিষ্ট একটা দেশে, তার থাকে কোনো না কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ টের পায় যেমন এক-একজন লোক, তেমনি গোটা সমাজ। এ ক্রিয়াকলাপ ব্যাপ্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে। অধিকাংশ রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকে নির্বাচিত ব্যক্তিরা: প্রেসিডেণ্ট, প্রধান মন্ত্রী, লোকসভা সদস্য ইত্যাদি। বড়ো একদল লোক রাষ্ট্রের সেবক। একদল থাকে প্রশাসনে, অন্যেরা ফৌজে, তৃতীয়রা কাজ করে ব্যাপক সংবাদের সংস্থায়। এই গ্রুপগুলো নিয়েই গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

ইতিহাসে রাষ্ট্রের বদল হয়েছে অনেক, শাসনের রূপ, ক্রিয়াকলাপের ধারা, রাজনৈতিক পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে সেগুলি পরস্পর পৃথক।

ভূমণ্ডলে প্রথম রাষ্ট্র দেখা দেয় প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। সেগুলি অপরিবর্তিত থাকে নি, একটার বদলে এসেছে অন্যটা। বর্তমানে দুনিয়ায় রাষ্ট্র আছে ১৬০টির বেশি। ভূখণ্ডের আয়তন, লোকসংখ্যা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূলগত পার্থক্য রয়েছে সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে।

রাষ্ট্রের মতো এত জটিল ও বহুরূপী একটা ব্যাপারকে জানতে হলে দরকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রশ্নটির তাত্ত্বিক চর্চা।

সুদূর অতীত কালে এবং মধ্য যুগে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা হত ঈশ্বরতাত্ত্বিক ধারায়। যেমন, 'প্তাখোতেপের উপদেশে' (মিশর, খ্রিঃ পূঃ ৩য় সহস্রক) 'ভগবান' শব্দটা প্রায়ই 'ফেরাও' (মিশর সম্রাট) শব্দের সঙ্গে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর অধিকর্তার নিকট শর্তহীন বাধ্যতাকে বলা হয়েছে সর্বোচ্চ পুণ্যকর্ম। 'ইপুসেরের বচনে' (মিশর, খ্রিঃ পূঃ ৮ম শতক) রাজার ইচ্ছাকে ঘোষণা করা হয়েছে রাষ্ট্রের সমস্ত ঘটনার উৎস বলে। প্রাচীনতম যেসব আইনের কথা আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে তা রাষ্ট্রের উদ্ভব ও কাজ সম্পর্কে ধর্মীয় ধারণায় আচ্ছন্ন। আধুনিক কিছু কিছু বুর্জোয়া ভাবাদর্শীও রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তি ও নির্বন্ধের কথা প্রচার করছেন। যেমন, মধ্য যুগের দার্শনিক ও ঈশ্বরতাত্ত্বিক টমাস আকুইনাসের

(১২২৫ বা ২৬ — ১২৭৪) মতামতকে ক্যাথলিকরা তাদের সরকারি মতবাদ বলে মানেন। তিনি রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নিতে বলেছেন কেননা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঐশ্বরিক।

রাষ্ট্র এসেছে তথাকথিত চুক্তি থেকে এমন একটা ধারণাও প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। আদি বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে যে 'স্বর্ণযুগের' স্থলে আসে সামাজিক অসাম্য, প্রতারণা, চুরিচামারি। এইসব পাপ দূর করার জন্য লোকে রাজার শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক উদ্ভবের কথাটা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে ইওরোপে সামন্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সংগ্রামের পর্বে, সতেরো-আঠারো শতকে। সামন্তদের রক্ষক রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য এইটে দেখাবার প্রয়োজন হয়েছিল যে তার ক্ষমতা মোটেই ঐশ্বরিক নয়, এ ক্ষমতা লোকেরাই বানিয়েছে। রাষ্ট্র চুক্তিপ্রসূত, এ তত্ত্বের প্রণেতারা দাবি করেন যে পুরাকালে লোকে থাকত যাকে বলে স্বাভাবিক অবস্থায়। প্রকৃতির সন্তান হিশেবে, তাদের মেলামেশা চলত প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু পরে লোকেদের মধ্যে দেখা দিল শত্রুতার সম্পর্ক, নিজেদের নিরাপত্তা, নিজেদের যেন-বা জন্মগত অধিকার রক্ষার প্রয়োজন হল। তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা কয়ে নিয়ে স্থাপন করল রাষ্ট্র। সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব বুর্জোয়াদের সাহায্য করে ক্ষমতায় আসতে এবং জনগণের মনে এই মিথ্যে ধারণা জন্মাতে যে নতুন বুর্জোয়া রাষ্ট্র হল লোকেদের সাধারণ সম্মতির ফল, তাই তা রয়েছে সকলের স্বার্থে।

সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক বলা চলে না। তার পক্ষপাতীরা ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব এবং শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করেন। তাই ঈশ্বরতাত্ত্বিক তত্ত্বের মতো সামাজিক চুক্তি তত্ত্বেরও লক্ষ্য একই — রাষ্ট্রের অন্যায়, শোষক চরিত্র চাপা দেওয়া।

কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে জ্ঞান সঞ্চিত হতে থাকে, রাষ্ট্রের মর্মার্থের সঠিক উপলব্ধির কাছে এসে যায় মানবজাতি। এমনকি পূর্বোক্ত চুক্তি তত্ত্বেও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক চিন্তার মুক্তি দেখা গেছে। প্রাচীন কালের কিছু কিছু দার্শনিক লক্ষ করেছিলেন যে ধনী আর দরিদ্র, বিত্তবান আর নির্বিত্তের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে দানা বাঁধছে তার ওপর রাষ্ট্রের ব্যবস্থা খানিকটা নির্ভর করে।

রাষ্ট্র বিষয়ক মতবাদের ইতিহাসে রাষ্ট্র সম্পর্কে, তার মর্মার্থ ব্যাখ্যায় দুটি মূল মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে। তার একটায় প্রকাশ পায় শোষকদের স্বার্থ এবং তাদের প্রভুত্বের সমর্থন। এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষপাতীরা জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে শাসন চালাতে পারে কেবল বাছা বাছা লোকেরা। অন্য ধারার পক্ষপাতীদের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধিকাংশের ওপর অল্পাংশের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপক স্তরগুলির প্রতিবাদ। যেমন, প্রটাগোরাস (খ্রিঃ পূঃ আনুঃ ৪৯০-৪২০, গ্রীস) এই অভিমতে এসেছেন যে রাজনৈতিক জীবনে সমস্ত

নাগরিকের অংশ নেওয়া উচিত, রাষ্ট্রিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার থাকা চাই তাদের। প্লেটোর (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) ছিল বিপরীত মত। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র হল অভিজাত প্রজাতন্ত্র, অর্থাৎ রাষ্ট্রের এমন সংগঠন যেখানে আধিপত্য করবে বাছা বাছা, সেরা আর জ্ঞানী লোকেরা। গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের ক্ষমতাকে প্লেটো গণ্য করেছেন রাষ্ট্রের নিকৃষ্ট রূপ বলে।

রাজনৈতিক চিন্তার গণতান্ত্রিক ধারা প্রবল হয়ে ওঠে যখন জেগে ওঠে শোষকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলন। যেমন জার্মানিতে কৃষক সমরের সময় দেখা দিল টমাস মুনৎসারের (আনুঃ ১৪৯০-১৫২৫) বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক মতবাদ। সতেরো শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় ইংলণ্ডে ডিগার্সরা (খননকারী) ছিল গরিব চাষি ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থবাহী। ইংলণ্ডে সে সময়কার বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে প্রমুখ ব্যক্তি হলেন ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী জেরার্ড ইউনস্টেনলি (১৬০৯-১৬৫২'র পর)।

রাষ্ট্র সম্পর্কে বৈপ্লবিক-গতণান্ত্রিক চিন্তাধারা দেখা গিয়েছে আঠারো শতকের প্রাগ্‌বিপ্লব ফ্রান্সের মনীষীদের মধ্যে, বিশেষ করে জ. জ. রুসো (১৭১২-১৭৭৮), ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী জ. মেলিয়ে (১৬৬৪-১৭২৯), গ. ব. মাব্লি (১৭০৯-১৭৮৫), শ. ফুরিয়ের (১৭৭২-১৮৩৭) নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ারও বৈশিষ্ট্য বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। যেমন রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী ন. গ. চের্নিশেভস্কির

রচনা রাষ্ট্র বিষয়ে সুগভীর চিন্তায় সমৃদ্ধ। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইউটোপীয় হলেও তিনি ছিলেন পুঁজিতন্ত্রের প্রগাঢ় সমালোচক।

রাষ্ট্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদয় সম্ভব হয় কেবল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী ব্যাখ্যা শুরু হবার পর। এ তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)।

তাঁদের আগে আর কেউ সমাজ, রাষ্ট্রের বিকাশ আর ব্যাপক জনগণের বৈপ্লবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তত্ত্বে মেলাতে পারেন নি। মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আর তার মর্মার্থের প্রতি বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গি অঙ্গাঙ্গিরূপে মিলিত। ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থার জন্য জনগণের সংগ্রাম দাঁড়াতে লাগল পাকাপোক্ত বৈজ্ঞানিক বনিয়াদের ওপর। তাঁরা যে ভিত্তি পেতে যান, ভ. ই. লেনিন যাকে বর্তমান যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে বিকশিত করে তোলেন, তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম।

রাষ্ট্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদে সন্দেহাতীত রূপে দেখানো হয়েছে যে অল্পাংশ কর্তৃক অধিকাংশকে, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ কেবল অমানুষিকই নয়, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক, শোষণের অবসান ঘটানো যায় যদি কোটি কোটি মেহনতি কাজটা নেয় নিজেদের হাতে।

রাষ্ট্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদকে বিকৃত

করার জন্য সমাজতন্ত্রের শত্রুরা অবিরাম সচেষ্ট। আর শোষক শ্রেণীরা যতদিন থাকছে ততদিন বৈপ্লবিক মতবাদ থেকে মেহনতিদের সরিয়ে আনার প্রয়াস চলতেই থাকবে। তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম প্রাণবন্ত, বিকাশমান, ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে তার অনুরাগীদের। বর্তমানে সমস্ত মহাদেশেই এমন রাষ্ট্র রয়েছে, যাদের ক্রিয়াকলাপ চলে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভিত্তিতে, ৯০টির বেশি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদের সারার্থ কী? মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান থেকে আধুনিক রাষ্ট্রের মূল্যায়ন করা হয় কিভাবে? এইসব প্রশ্ন নিয়েই বর্তমান বইটি লিখিত।

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্ভব ও মর্মার্থ

১। রাষ্ট্র-তত্ত্বের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

সমগ্রভাবে মানবসমাজ, বিশেষ করে রাষ্ট্রের বিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রতিফলিত করতে হবে জীবনকে, সঠিক বাস্তবতাকে। রাষ্ট্র অধ্যয়নের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির মূলনীতিগুলি এই: প্রথমত, মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্র বিকাশমান, তাই তার ক্রিয়াকলাপে যেগুলি সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী, সেগুলিকে আলাদা করে নিতে হবে সুস্থায়ী, সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলি থেকে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা রাখেন তার মূর্তনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উপস্থাপনে। তার অর্থ, স্থির করে নিতে হবে কথাটা হচ্ছে কোন রাষ্ট্র নিয়ে: সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া, সমাজতান্ত্রিক, অথবা উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্র

যার মধ্যে থাকে দুটি ভাগ, বিকাশের সমাজতান্ত্রিক অথবা পুঁজিতান্ত্রিক পথ যারা নিয়েছে।

মানবসমাজ যে যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তারও বৈশিষ্ট্য মনে রাখা দরকার। বর্তমানের সমস্ত রাষ্ট্র রূপ নিচ্ছে ও কাজ করছে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে ক্রমিক উত্তরণের যুগে। এ যুগের বৈশিষ্ট্য পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক — এই দুই বৈরী বিশ্ব ব্যবস্থার অস্তিত্ব, ব্যাপক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, শান্তির জন্য, পৃথিবীতে পারমাণবিক অগ্নিকান্ড নিবারণের জন্য জনগণের সংগ্রাম। এই সামাজিক বিশ্ব প্রক্রিয়াগুলির বাইরে আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনীতি বিচার করা সম্ভব নয়। প্রশ্নটির মূর্তনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উপস্থাপনে জাতীয়-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে রাখা দরকার, প্রতিটি রাষ্ট্রই এ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

তৃতীয়ত, এবং এটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হয় যদি একে বিচার করা হয় এক দেশটার অর্থনৈতিক সম্পর্ক, তার ভিত্তিতে শ্রেণীগুলির, সমস্ত সামাজিক গ্রুপের মৌল স্বার্থ, সমাজটির সাংস্কৃতিক মানের সঙ্গে আঙ্গিক যোগাযোগে। শ্রেণী সমাজের প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রের উদ্ভবানুযায়ী এক-একটি ঐতিহাসিক টাইপের অন্তর্গত। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও অস্তিত্বের বৈষয়িক ভিত্তিটা উপেক্ষা করলে তার মর্মার্থের সঠিক উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। পেছনকার সামাজিক-অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত কারণে

মনোনিবেশ না করলে বোঝা যাবে না কেন একযুগে দেখা দিচ্ছে এক ধরনের রাষ্ট্র, অন্য যুগে অন্য রকম।

সমাজের বৈষয়িক ও আত্মিক বিকাশের যে মান অর্জিত হল, রাষ্ট্র তার ফল এই অবজেকটিভ ঘটনাটা বিবৃত করেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব থেমে যায় না। অন্য একটা প্রশ্নও উত্থাপন করে মার্কসবাদীরা; সমাজের গঠনে রাষ্ট্রের পক্ষে কোনটা মূলগত, নির্ধারক। এ প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য হয় সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের বস্তুবাদী বোধে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের স্রষ্টা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের কৃতিত্ব এইখানে যে সমাজের পরিবর্তনকে তাঁরা দেখেছেন অবজেকটিভ স্বাভাবিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিশেবে। সমাজকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তির এলোমেলো খামখেয়ালি ক্রিয়াকলাপের ফল, তাদের সাবজেকটিভ ইচ্ছার পরিণাম হিশেবে দেখার ভাববাদী ধারণার বিপরীত হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বস্তুবাদী তত্ত্ব। ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের তাৎপর্য এইখানে যে সমাজ বিকাশের অবজেকটিভ নিয়মগুলিকে তা আবিষ্কৃত এবং তত্ত্বগতভাবে প্রতিপাদিত করেছে। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের প্রতিটি স্তরেই থাকে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে লোকেদের মধ্যে তদুপযোগী সম্পর্ক। সমাজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের প্রণালীর বিকাশ ও পরিবর্তনকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মনে করে একটা সমাজব্যবস্থার অন্যটায় পরিবর্তনের প্রধান কারণ।

লোকেদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যবস্থায় মার্কস ও

এঙ্গেলস আলাদা করে নেন উৎপাদনী সম্পর্ককে, অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক সেইটাকে। এই সম্পর্কগুলিই হল সমাজজীবনে নির্ধারক। উৎপাদন বিকাশের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে জীবনের সামাজিক শর্ত, লোকেদের বড়ো বড়ো গ্রুপের স্বার্থের মিল। সমাজে এই ধরনের মূল গ্রুপগুলি হল শ্রেণী।

শ্রেণী বলতে মার্কসবাদীরা কী বোঝে? 'ইতিহাসের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট একটি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন দ্বারাও বিধিবদ্ধ), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা, এবং সেই হেতু সামাজিক সম্পদের যে অংশে তাদের অধিকার তা পাবার পদ্ধতি ও পরিমাণের দিক থেকে লোকেদের বড়ো বড়ো যে গ্রুপগুলি বিভিন্ন, তাদের বলা হয় শ্রেণী। শ্রেণী হল তেমন লোকেদের গ্রুপ, যাদের মধ্যে সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট একটি ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থানের দৌলতে একদল অন্যদলের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।*'

শ্রেণী দেখা দেয় উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, সম্পত্তিগত অসাম্য উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবেই দেখা দিল ধনী আর দরিদ্র, মালিক আর মেহনতি। তাদের স্বার্থ যে কেবল বিভিন্ন নয়,

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 29, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 421.

সরাসরি বিপরীতই তা স্পষ্ট। তাই বৈরী শ্রেণী দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

একটা শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণের তিনটি প্রধান রূপ ইতিহাসে জানা আছে: দাসপ্রথা, সামন্ততান্ত্রিক অধীনতা, পুঁজিতন্ত্রে মজুরি শ্রম শোষণ। সেই অনুসারে বদলেছে সমাজের শ্রেণীগত গঠন। প্রথম শ্রেণী বিভাগ (মোটামুটি খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রক) ছিল অল্পাংশ দাসমালিক আর অধিকাংশ দাসদের নিয়ে। দাসমালিকরা ছিল উৎপাদনের সমস্ত উপায়, সেইসঙ্গে দাসদের মালিক, দাসেরা তাদের কাছে গণ্য হত নিতান্ত একটা জিনিস বলে।

দাসপ্রথার জায়গায় এল সামন্ততন্ত্র। সামন্তরা হয়ে দাঁড়ায় ভূমি এবং তাতে যা থাকে, জন্মায়, এমন সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিক। কৃষকেরা হয়ে দাঁড়ায় কার্যত বড়ো বড়ো ভূস্বামীর সম্পত্তি, কিন্তু দাসদের থেকে তাদের তফাৎ হল বিনা শাস্তিতে কৃষককে খুন করা চলত না। উৎপাদনের কিছু কিছু উপায় (ঘোড়া, গরুভেড়া, লাঙল) কৃষকদের হাতে থাকত, নিজের ঘরবাড়ি, সংসারও ছিল তাদের।

সামন্ততন্ত্রের বদলে এল উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালী, যাতে মালিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় উৎপাদনের সমস্ত উপায়। দাস ও সামন্তাধীন কৃষকদের থেকে এখন উৎপাদকেরা, মজুরি-খাটা শ্রমিকেরা বাহ্যত স্বাধীন। কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে তারা পুরোপুরি পুঁজিপতিদের অধীন, কেননা নিজেদের

শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয় তারা। জীবনধারণের জন্য শ্রমিককে মালিক দেয় তার উৎপন্ন দ্রব্যের নগণ্য একটা অংশ, আর বাকিটা, সমস্ত বাড়তি উৎপন্নটা নিজে আত্মসাৎ করে।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে সর্বাগ্রে সেই লোকেরা যারা স্বার্থের ঐক্যে মিলিত, শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপেরা। কাদের স্বার্থে রাষ্ট্র কাজ চালাচ্ছে, রাষ্ট্রের ওপর কোন শ্রেণীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি, এই হল প্রশ্ন। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে তেমন শ্রেণী হল বুর্জোয়ারা। শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতি জনগণ নিজেদের অধিকারের জন্য সামাজিক সংগ্রাম চালায়। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ধরে রাখার জন্য, রাষ্ট্রকে মেহনতিদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার করে তোলার জন্য প্রয়োজন আমূল সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, খোদ পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্মার্থেই পরিবর্তন।

সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয় কিছু একটা নয়। তা পরিবিকশিত হয়, সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। রাষ্ট্রের ওপর অতি বিভিন্ন সব ঘটনাচক্রের প্রভাব পড়ে। তার মধ্যে প্রধান হল উৎপাদনের যে প্রণালীর আধিপত্য থাকছে। সমাজে উৎপাদনের প্রতিটি প্রণালীতেই থাকে ইতিহাসের দিক থেকে নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণী তথা অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে আধিপত্যকারী শ্রেণী। তার স্বার্থই রক্ষা করে রাষ্ট্র।

২। কিভাবে কোথা থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব

রাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ নির্ণয় কেবল ঐতিহাসিক তাৎপর্যই ধরে না। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাম্প্রতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ভালো দিশা পাওয়া, কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরাবে সেটা জানায় সাহায্য হয় তাতে। কেননা যদি জানা থাকে কেন এবং কী অবস্থায় রাষ্ট্র দেখা দিয়েছিল তাহলে কবে রাষ্ট্র শুকিয়ে মরবে, তার প্রয়োজন থাকবে না, এ প্রশ্নেরও উত্তর মিলবে।

ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে লোকেদের আদি রূপের সংগঠন হল কমিউন বা গোষ্ঠীসমাজ। শ্রম, বাসস্থান, সম্পত্তি, জীবনধারণের উপায় সংগ্রহের দিক থেকে লোকেরা ছিল ঐক্যবদ্ধ। গোষ্ঠীতে ছিল আত্মশাসন, অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যই অংশ নিত। সবাই ছিল পরস্পর সমান। কমিউনের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ আপোসে মিটিয়ে ফেলা হত নতুবা প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী অবাধ্যকে বিতাড়িত করা হত কুল থেকে। কমিউনগুলি মিলিত হত উপজাতিতে। গোটা উপজাতির সাধারণ সম্পত্তি ছিল ভূমি; নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা ছিল গোটা উপজাতির কর্তব্য।

এইভাবে কমিউন আর উপজাতি উভয়েরই ছিল ক্ষমতা, কুলের সমস্ত সদস্য থাকত একক ইচ্ছার অধীনে। হাজার হাজার বছর ধরে গোষ্ঠী-উপজাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল ক্ষমতা চালাবার নিজস্ব রূপ। কুল সদস্যদের সাধারণ জমায়েতে নির্বাচিত হত

কুলপ্রধান, মণ্ডল, সেনানায়কেরা। কিন্তু তাদের কারোরই আদেশ, নির্দেশ পালনের জন্য বাধ্যকরণের কোনো বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হত না: তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠা আর রীতিনীতির প্রভাবই ছিল যথেষ্ট। কৌলিক-উপজাতীয় সম্পর্কের জের কোনো কোনো দেশে আমাদের কাল অবধি অংশত টিকে থেকেছে। তবে বর্তমান গোষ্ঠী সমাজগুলি সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রবল প্রভাবের কবলিত। যে উপজাতিগুলি টিকে থেকেছে, তারা বাস করে কোনো না কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে, এবং সে রাষ্ট্রের আইন-কানুনের অধীনস্থ।

তবে হাজার দশেক বছর আগে কৌলিক-উপজাতীয় সম্পর্ক ক্রমশ বদলাতে থাকে। তার আদি কারণ হল কমিউন, উপজাতিগুলির মধ্যে শ্রম বিভাগ দেখা দেয়। প্রথম পৃথক হয়ে ওঠে পশুপালক গোষ্ঠী, উপজাতিগুলি, পরে কারুজীবীরা। বেড়ে উঠতে থাকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা, প্রত্যেকের নিতান্ত জীবনধারণের জন্য যতটুকু দরকার উৎপন্ন দ্রব্য হয়ে দাঁড়াল তার চেয়ে বেশি। ফলে দেখা দিল সঞ্চয়ের সুযোগ। শ্রম বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সমতার জায়গায় ক্রমশ আসতে লাগল অসমতা। বাড়তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কুলসদস্যদের মধ্যে তা বণ্টনে অসমতা সম্ভব হল, ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে থাকল সবার নয়, পরিচালক, মণ্ডলদের ধনবৃদ্ধির স্বার্থে। পরাজিতদের মেরে ফেলার চেয়ে বন্দী করে দাসত্বে নিক্ষেপ করা হয়ে দাঁড়াল লাভজনক, কেননা তার শ্রমোৎপন্নে মেহনতির

সামান্য খাওয়া-দাওয়া জুটত তাই নয় দাসমালিকের ধনবৃদ্ধিও সম্ভব হত।

এইভাবে গোষ্ঠীসমাজে আলাদা হয়ে উঠল একটা সংখ্যাল্প অংশ যারা সঞ্চিত সম্পদ হস্তগত করত। আত্মশাসনের সংস্থাগুলি বেড়ে উঠতে থাকল অল্পাংশ কর্তৃক অধিকাংশকে পীড়নের সংস্থা হিশেবে। তবে ক্ষমতার সংস্থায় পরিণত হবার পক্ষে পুরনো উপায়াদি-রীতিনীতি, পরিচালকদের নৈতিক প্রতিষ্ঠা, সাধারণ সিদ্ধান্ত দিয়ে আর কাজ হচ্ছিল না। দেখা দিল বিশেষ বাহিনী, সর্বাগ্রে ফৌজ, যা অস্ত্রবলে, তা প্রয়োগের হুমকি দিয়ে ধনীদের, যারা ভূমি, পশুপাল, দাসদের মালিক তাদের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারত। দমন ও বাধ্যকরণের সংস্থা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে রাষ্ট্রের ইতিহাস।

এইভাবে রাষ্ট্র আদিম গোষ্ঠীগত আত্মশাসন থেকে নীতিগতভাবে পৃথক। তার উদ্ভবে সূচিত হয় মানবজাতির বিকাশে গুণগতভাবে নতুন একটি পর্যায়। গোষ্ঠীগত আত্মশাসন আর শোষক রাষ্ট্রের তফাৎটা এই যে রাষ্ট্র দেখা দেয় তেমন পরিস্থিতিতে যখন সমাজ সদস্যদের মধ্যে স্বার্থে ঐক্য আর নেই, আপোসহীন বিরোধে তা বিদীর্ণ। আত্মশাসন সম্ভব কেবল তখন, যখন সমাজে আধিপত্য করছে স্বার্থের মিল, যখন তেমন একদল লোকের প্রয়োজন হয় না যারা সবাইকে একক ক্ষমতার অধীনস্থ করবে। এঙ্গেলস লিখেছেন: রাষ্ট্র দেখা দিতে না দিতেই তা অর্জন করল সমাজ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা, সাহায্য করল শ্রেণীগত অসাম্যের

সংহতিতে, হয়ে দাঁড়াল সংখ্যাল্পের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় শক্তি।*

৩। রাষ্ট্রের মর্মার্থ

রাষ্ট্রের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের অর্থ সবচেয়ে যেটা প্রধান তার ক্রিয়াকলাপ ও সংগঠনের মূলকথাটা তুলে ধরা। রাষ্ট্রের মর্মার্থের প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চায় পুঁজিতন্ত্রের উকিলেরা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে দেখাতে চায় সাধারণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সর্বজনীন ন্যায় আর সমন্বয়ের শ্রেণী-ঊর্ধ্ব হাতিয়ার বলে। সেইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্মার্থকে তারা বিকৃত করে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে শোষক রাষ্ট্র সত্যিই সমগ্র সমাজের স্বার্থ প্রকাশ করছে, সবার কাছে দৃশ্যমান একটা সংগঠনে মিলিত করছে সমাজের সমস্ত সদস্যদের। তবে এমন কোনো রাষ্ট্র ছিল না এবং নেই যা শোষক এবং শোষিত উভয়ের স্বার্থই প্রকাশ করেছে সমমাত্রায়। যেসব দেশে সংখ্যাল্পের হাতে জাতীয় সম্পদের মূলভাগটা কেন্দ্রীভূত, রাষ্ট্র সেখানে সবার স্বার্থের রক্ষক নয়, সর্বাগ্রে তা অধিকাংশের পীড়ক। এই মূলকথাটাতেই উদ্‌ঘাটিত হয় রাষ্ট্রের মর্মার্থ বা তার শ্রেণীগত চরিত্র, রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের সত্যকার অর্থ বোঝা সম্ভব হয় তাতে।

---

* See: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. Three, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 371.

যেকোনো রাষ্ট্রই তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদ দ্বারা নির্ধারিত। রাষ্ট্র যদি স্থাপিত হয় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ধনী কর্তৃক দরিদ্রদের শোষণের ওপর তাহলে রাষ্ট্র অনিবার্যতই হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যাল্পদের হাতে নিজেদের আধিপত্য সংহত করার হাতিয়ার। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাম্প্রতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি এইরকমই। সমাজ যদি গড়ে ওঠে সকলের পক্ষে সাধারণ মালিকানার ওপর, যদি তাতে অসাম্য এবং একদল কর্তৃক অন্যদলকে শোষণের অবজেকটিভ শর্ত না থাকে (সমাজতান্ত্রিক সমাজ হল ঠিক তাই), তাহলে রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশের অস্ত্র।

প্রশ্ন উঠতে পারে: বুর্জোয়া রাষ্ট্র যদি অল্পাংশের স্বার্থই রক্ষা করে, তাহলে তেমন রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারছে কেমন করে? তেমন উপায় কম নেই। তার একটা উপায় — রাজনৈতিক বহুত্ব, একাধিক পার্টি। বুর্জোয়া রাষ্ট্র নাকি সমগ্র জনগণের স্বার্থ প্রকাশ করে এই মোহ সৃষ্টিতে বুর্জোয়া পার্টিগুলি সচেষ্ট। রাষ্ট্রপতি, লোকসভা সদস্যদের নির্বাচনে প্রতিটি পার্টিই সাধারণত নিজেদের প্রার্থী দেয়। তাদের প্রত্যেকেই চায় ক্ষমতায় আসতে, রাষ্ট্রিক সংস্থাগুলিতে স্থান নিতে। শাসক পার্টির পরিবর্তনে পরিচালনা নতুন হল এই ভাব করে শোষকেরা নিজেদের ক্ষমতা জোরদার করার সুযোগ পায়। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যেন নির্বাচকদের মনোভাব পরিবর্তনে রাষ্ট্র তৎপর সাড়া দিচ্ছে।

আসলে বদলায় কেবল পলিসির মাত্রাভেদ, বুর্জোয়া আধিপত্যের মূলকথাটা থেকে যায় অপরিবর্তিত। এর দৃষ্টান্ত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসক পার্টির বদলাবদলি। প্রজাতান্ত্রিক আর গণতান্ত্রিক দুই পার্টিরই প্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালায় নির্বাচকদের প্রতারণার উপায় নিয়ে। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রস্তুতিতে প্রার্থীরা সর্বোপায়ে নির্বাচকদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে, প্রতিশ্রুতি দেয় যতরাজ্যের কল্যাণের। কিন্তু ক্ষমতায় এক পার্টির পর অন্য পার্টি আসায় যা দেখা গেছে, অধিকাংশ আশ্বাসই প্রতারণা। নির্বাচকেরা ভোট দেয় বুঝি-বা তাদের স্বার্থের অভিব্যক্তাকে আর কার্যক্ষেত্রে নির্বাচিত করে পুঁজির প্রভুত্ব জোরদার করার জন্য অধিপতি সংখ্যালঘুদেরই একজন প্রতিনিধিকে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী মর্ম সর্বদা স্বতঃস্পষ্ট নয়। রাষ্ট্র তার ক্রিয়াকলাপে অপেক্ষাকৃত যেন স্বাধীন, এই আপেক্ষিক স্বাধীনতাটা ধরা হয় এই দিক থেকে যে রাষ্ট্রকে ভারসাম্য রাখতে হবে: শুধু বুর্জোয়ার স্বার্থ রক্ষা নয়, মেহনতিদের স্বার্থের কথাও মনে রাখতে হবে, নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সংগ্রামে নিজেদের অধিকার রক্ষায় তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে গণ্য না করে চলে না। অন্তত সাময়িকভাবে হলেও লক্ষ লক্ষ মেহনতি জনগণের দাবি খানিকটা না মেনে নিয়ে তাদের হামলার সামনে কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রই টিকতে পারে না।

রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলে বহু সংখ্যক যত

ব্যাপার, তার ওপর নির্ভর করে অর্থনীতিতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির ক্রিয়াকর্ম কী দাঁড়াবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আটকে রাখে সামাজিক বিকাশ, সমাজের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের সেবা করে, অন্যক্ষেত্রে অনুসরণ করে শ্রেণী বিরোধ নরম করে আনার পলিসি। এমন ঘটনাও বাদ যায় না যখন সমাজে শোষণ সম্পর্ক বজায় থাকলেও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে রাষ্ট্রকে রীতিমতো প্রভাবিত করতে পারে এবং তার মারফত, অংশত হলেও, গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ঘটায়। তাই পুঁজিতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির প্রসারের জন্য মেহনতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে কমিউনিস্টরা। সেইসঙ্গে কমিউনিস্টরা বোঝে যে সবচেয়ে উত্তম সংস্কারেও রাষ্ট্রের মর্মার্থ বদলায় না। তার জন্য দরকার সুগভীর সামাজিক পুনর্গঠন, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কেবল তার ফলেই দেখা দেয় নীতিগতভাবে নতুন রাষ্ট্র। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

৪। রাষ্ট্রের মূল লক্ষণ

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল তার ক্ষমতা সমাজের সমস্ত সভ্যের ওপর প্রসারিত, অর্থাৎ এ ক্ষমতার চরিত্র সার্বিক। রাষ্ট্রীয় সংস্থার সিদ্ধান্তগুলি সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কেবল রাষ্ট্রই এমন নিয়ম, আচরণের মানাদর্শ জারি করতে পারে যা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির ভূখণ্ডের অধিবাসী সকলের পক্ষে, তথা অন্য দেশের

যে নাগরিকেরা সে রাষ্ট্রের এলাকায় রয়েছে তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক আইন জারি করে রাষ্ট্র সযত্ন থাকে যাতে সে আইন পালিত হয়।

রাষ্ট্রের মূলগত সংগঠন হল তার শাসনযন্ত্র। রাষ্ট্র হল এমন কতকগুলি সংস্থা, প্রতিষ্ঠানাদির ব্যবস্থা যা ক্ষমতা কার্যকৃত করে। এই ধরনের সংস্থা হল আইন প্রণয়নী ক্ষমতা (পার্লামেণ্ট, জাতীয় সভা, কংগ্রেস), স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্থা - মিউনিসিপ্যালিটি, পৌরসভা; সরকার এবং তদ্দ্বারা গঠিত শাসন সংস্থা --- মন্ত্রিসভা; আদালত, পুলিস, ফৌজ। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির ব্যবস্থা হল রাষ্ট্র ক্ষমতার আসল যন্ত্র। বুর্জোয়া সমাজে এটা সর্বাগ্রে দমন ও বাধ্যকরণের সংগঠিত শক্তি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে তা প্রধানত জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশ ও পরিচালনার যন্ত্র।

রাষ্ট্রের এই দুটি লক্ষণ — সিদ্ধান্তের বাধ্যতামূলকতা এবং বিশেষ যন্ত্রের অস্তিত্বে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটা জনসাধারণের চরিত্র লাভ করে। এই সাধারণ চরিত্রের দরুন রাষ্ট্র গোটা সমাজের পরিসরে একক নীতি অনুসরণ করতে পারে। অবশ্য ইতিহাসে দ্বৈত ক্ষমতার কথাও জানা আছে। সেটা ঘটে গৃহযুদ্ধ, একনায়কের বিরুদ্ধে ব্যাপক পার্টিজান আন্দোলনের পর্বে। তবে অচিরে বা বিলম্বে দেশে একক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতার এককতায় বোঝায় যে প্রশাসনের প্রতিটি সংস্থার আছে নিজের নিজের কাজ, নিজেদের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি অধিকার ও

কর্তব্য। সবাই তারা কাজ করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে।

রাষ্ট্রের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হিশেবে ক্ষমতার এককত্ব সকলে মানেন না। যেমন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতির একটিতে ক্ষমতার ভাগাভাগি স্বীকার্য। তার মূলকথা হল রাষ্ট্রে থাকা উচিত পরস্পর থেকে স্বাধীন কয়েকটি ক্ষমতা: আইন-প্রণয়নী, কার্যনির্বাহী, বিচার বিভাগীয়। এই নীতি সূত্রবদ্ধ হয় সর্বশক্তিমান সামন্তদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নবীন বুর্জোয়াদের সংগ্রামের সময়, তার উদ্দেশ্য ছিল রাজন্যদের ক্ষমতা সীমিত করা। তাই তৎকালে, সতেরো-আঠারো শতকে ইউরোপের মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এ নীতিটি ছিল প্রগতিশীল এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু বুর্জোয়া যতই ক্ষমতায় আসতে থাকল ততই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে রাষ্ট্র ক্ষমতা তার শ্রেণী মর্মার্থের, প্রধান ধারার দিক থেকে একক।

রাষ্ট্রের আরেকটা বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক অন্য কোনো ক্ষমতার কাছে রাষ্ট্রের কোনো অধীনতা থাকবে না, নিজের বিবেচনা অনুসারে অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আছে তার। সার্বভৌমত্বের ধারণা রূপ নেয় সামন্তদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গতিপথে যা জাতিদের রাষ্ট্রীয় আত্মনির্ধারণের অধিকার রক্ষা করে। তাই সার্বভৌমত্ব কেবল রাষ্ট্রের একটা লক্ষণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ একটা গণতান্ত্রিক অর্জনও,

জাতিসমূহের রাজনৈতিক স্বাধীনতার, আত্মনির্ধারণের অধিকার।

সাম্রাজ্যবাদ নয়া-ঔপনিবেশিক পলিসি অনুসরণ করছে বলে সার্বভৌমত্বের লোক-দেখানো ঠাট থেকেও বাস্তবে অর্জিত সার্বভৌমত্বকেও তফাৎ করা দরকার। কেননা অতীতের ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে কেবল মুক্তিতে আপনা থেকেই সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয় না। অনেক উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ, আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলির কাছে অর্থনৈতিক অধীনতায়।

নিজেদের ভূখন্ডকে প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করা ও সীমান্ত রক্ষার একচ্ছত্র অধিকার থাকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের। নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির অধিবাসীরা হয় সেই রাষ্ট্রের নাগরিক নয় বিদেশী যারা সে রাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের অধীন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা বলবৎ করে দেশের প্রশাসনিক-আঞ্চলিক বিভাগ: অঙ্গরাজ্য, প্রদেশ, ডিপার্টমেণ্ট, জেলা ইত্যাদি।

বিশ্বের বহু এলাকায় সীমান্তের সমস্যা একটা অতি জটিল আন্তর্জাতিক প্রশ্ন। তার কারণ রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থ সীমানায় প্রায়ই অদল বদল হয়েছে এবং সর্বদা তা জাতি ও জাতিসত্তাগুলির অধিবাসের সঙ্গে মেলে না। বিশেষ জটিল হল আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমানার সমস্যা। এ মহাদেশে ৪৪ শতাংশ সীমান্ত গেছে মধ্যরেখা ও সমাক্ষবৃত্ত ধরে, ৩০ শতাংশ সরল বা উপবৃত্ত রেখায় আর কেবল ২৬ শতাংশ স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমা বরাবর যা সাধারণত নরকুলগুলির

বসতি সীমানার সঙ্গে মেলে। সীমান্তের এইধরনের চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোবৃত্তির খোরাক যোগায়। শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে আফ্রিকায় যে সীমান্ত গড়ে উঠেছে তা বজায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা 'সংঘর্ষ স্ট্রাটেজি' বলে একটা কথা চালু করেছেন। সেটা এই কল্পকথার ভিত্তিতে রচিত যে আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য প্রাচ্যে নাকি সামরিক সংঘর্ষ অপরিহার্য। এধরনের তত্ত্বের পেছনে লুকিয়ে আছে উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রসঙ্গে ছুঁৎমার্গী মনোভাবই কেবল নয়, সাম্রাজ্যবাদ, সর্বাগ্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে রণনীতির দিক দিয়ে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত অঞ্চলেই নিজেদের 'উপস্থিতির' নীতি সমর্থনেরও প্রয়াস। ন্যায়বিচার করতে হলে যুগ যুগের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের ফলে যে অসমতার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা নির্মূল করা, জাতিগুলির মধ্যে অনাস্থা ও শত্রুতার অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

কমিউনিস্টরা সর্বদাই দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়াচ্ছে সার্বভৌমত্বের পক্ষে, জাতিগুলির নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারের পক্ষে। অস্তিত্বের প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনীতির ভিত্তিতে রয়েছে জাতিগুলির সমতা ও সার্বভৌমত্ব, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের জনগণকে মুক্তি দানের নীতি। নবীন রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা প্রয়াসকে সমর্থন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদের ভূভাগের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে দাঁড়ায়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নবীন রাষ্ট্রগুলির পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে

সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পর্কের নতুন ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পক্ষে দাঁড়ায়।

ফলত, রাষ্ট্রের মূলগত লক্ষণ হল: রাষ্ট্রক্ষমতার সার্বিকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক জারি করা আইনের বাধ্যতামূলকতা; শাসনের বিশেষ যন্ত্রের অস্তিত্ব; সার্বভৌমত্ব; রাষ্ট্রীয় সীমান্ত রক্ষা।

৫। রাষ্ট্রের টাইপ এবং কাজ

ইতিহাসে যতগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা জানা আছে, রাষ্ট্রের টাইপও ততগুলি। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে চারটি: দাসমালিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট। তদনুযায়ী আছে দাসমালিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আছে, যা কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ের উপযোগী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল নতুন একটা ঐতিহাসিক টাইপের রাষ্ট্র, কেননা তা সংখ্যাল্প শোষকদের স্বার্থরক্ষক নয়। রাষ্ট্র হিশেবে তার উদ্ভব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে, কাজ করে তা ব্যাপকতম মেহনতিদের স্বার্থে।

প্রতিটি ঐতিহাসিক টাইপের পরিধির মধ্যে থাকে মূর্ত-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, রূপ, শাসনতন্ত্র নিয়ে রাষ্ট্রের নানা প্রকারভেদ। যেমন, দাসমালিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রভূত। ছিল তাতে অসীম ক্ষমতাধারী

সম্রাট নিয়ে রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও ছিল, যার পরিচালনায় কোনো না কোনো ভাবে অংশ নিত সমস্ত স্বাধীন নাগরিক (দাস বাদে), ছিল আভিজাতিক প্রজাতন্ত্র যাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় দাসমালিক ঊর্ধ্ব স্তরের হাতে। তবে সর্বক্ষেত্রেই দাসমালিক রাষ্ট্র রক্ষা করেছে দাসমালিকদের স্বার্থ, নির্মমভাবে দমন করেছে উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে দাসদের অভ্যুত্থান।

সামন্ততন্ত্রে রাষ্ট্র সাধারণত রাজতান্ত্রিক: ক্ষমতা থাকত রাজা, মহারাজা, জার, শাহ্, সুলতান, সম্রাট, বাদশাহের হাতে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মাত্রায় তফাৎ থাকত, যাকে বলা হয় নগর প্রজাতন্ত্র তার স্থানও থাকত তার অভ্যন্তরে, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণী সর্বদাই ছিল বৃহৎ ভূস্বামী, সামন্ত জমিদাররা।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র খুবই বৈচিত্র্যে চিহ্নিত (সে বিষয়ে বিশদ বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই, মার্কস ও এঙ্গেলসের কথায়, বুর্জোয়া রাষ্ট্র হল গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীটির সাধারণ কাজকর্ম চালাবার একটি কমিটি।*

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ক্রিয়াকলাপের টিপিকাল রূপের দিক থেকে পরস্পর খুবই পৃথক। কিন্তু ক্রিয়াকলাপ তাদের সর্বদাই ব্যাপক মেহনতি জনগণের স্বার্থাধীন।

---

* See: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works,* Vol. 6, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 486.

এক থেকে অন্য টাইপে উত্তরণশীল রাষ্ট্রের দৃষ্টান্তও অতীতে এবং বর্তমানে কম নেই। যেমন বর্তমানে ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কী হবে সে প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজছে। তাদের কতকগুলি চলেছে জটিল উত্তরণের মধ্যে দিয়ে। একদল সমাজতন্ত্রে, অন্যেরা পুঁজিতন্ত্রে যাবার পথ ধরেছে।

রাষ্ট্রগুলিকে উপরোক্ত টাইপে ভাগ করা হয়েছে রাষ্ট্রের প্রশ্নকে বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। অন্যথায় বিভ্রম ঘটে, বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার একটা বিকৃত ধারণা জন্মায়। যেমন, বুর্জোয়া তত্ত্বকারেরা বর্তমানের সমস্ত রাষ্ট্রকে তথাকথিত 'প্রাচ্য' ও 'প্রতীচ্যের' মধ্যে ভাগ করেন। তার খানিকটা কারণও আছে অবশ্য: এই দুই দিকের দেশগোষ্ঠীর নিজ নিজ অতীত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মিল আছে। আর ঐতিহ্যের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অতীতের হিশেব না নিয়ে এগুনো যায় না। কিন্তু তার মানে কি এই যে সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়া আর পুঁজিতান্ত্রিক ফ্রান্স, সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়া আর পুঁজিতান্ত্রিক বেলজিয়াম সবই সর্বাগ্রে ইউরোপীয় রাষ্ট্র বলে বিবেচ্য। 'প্রাচ্য' আর 'প্রতীচ্য' বলে ভাগ করলে দাঁড়ায় যে কিউবা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যেন কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ভেদ নেই দুই-ই পশ্চিম গোলার্ধের দেশ। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক জার্মানি আর ভিয়েতনাম একেবারেই আলাদা কেননা একটি ইউরোপে অন্যটি এশিয়ায়। অথচ আসলে সবই উলটো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার প্রতি শত্রুতার পলিসি অনুসরণ করে কারণ তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অন্য দিকে গণতান্ত্রিক জার্মানি আর ভিয়েতনামের মধ্যে রয়েছে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক, কেননা তাদের মিল একই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে। এ দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু সেটা কেবল অর্থনীতি, সংস্কৃতির মাত্রায়, সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্যায়ে। কিন্তু গণতান্ত্রিক জার্মানি আর বর্তমান ভিয়েতনামের রাষ্ট্রের মর্মার্থ একই: এগুলি সমাজতান্ত্রিক টাইপের রাষ্ট্র।

যেকোনো টাইপের রাষ্ট্রের শ্রেণী মর্মার্থ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় তার ক্রিয়াকলাপে। যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল জনগণ কর্তৃক অর্থনীতির পরিচালনা, শ্রম ও পরিভোগের পরিমাণের ওপর নিয়ন্ত্রণ। এটা আসে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা থেকে, সমাজতন্ত্রের প্রধান নীতি রূপায়নের প্রয়োজন থেকে: প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সেটা বাতিল, কেননা পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদই হল ব্যক্তিগত মালিকানা এবং কারখানা মালিকদের মুনাফা অর্জন। বুর্জোয়া রাষ্ট্র এমন সব কাজ চালায় যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, যেমন মেহনতিদের দমন ও পীড়ন। বুর্জোয়া আর সমাজতান্ত্রিক বহির্নীতিও আমূল পৃথক। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি চালিত বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া দমন, যেকোনো উপায়ে পুঁজিতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা রক্ষণ, যুদ্ধের বিপদ বর্ধনের

লক্ষ্যে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরা অনুসরণ করে শান্তির নীতি, পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা, জাতিতে জাতিতে সমঝোতা ও মৈত্রী দৃঢ় করায় তারা চেষ্টিত, গণতন্ত্র ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে সাহায্য করে তারা।

৬। রাষ্ট্রের রূপ

কোনো একটা রাষ্ট্রের রূপবৈশিষ্ট্য স্থির করার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাকে দেখে একাধিক দিক থেকে: রাষ্ট্রযন্ত্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চালনার ব্যবস্থা, শাসনের রূপ, এবং রাষ্ট্রিক গঠন, রাজনৈতিক আমল, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, গণতন্ত্র।

রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে বোঝা হয় রাষ্ট্রের কাজ চালাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির ব্যবস্থা। রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে ওঠে ক্ষমতার সংস্থা (রাষ্ট্রপ্রধান, লোকসভা, সরকার), প্রশাসনের সংস্থা (সরকার, মন্ত্রিসভা, প্রশাসনের অন্যান্য সংস্থা), শৃঙ্খলা রক্ষার সংস্থা (আদালত, অভিশংসক, মিলিসিয়া বা পুলিস), রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম (সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি)। রাষ্ট্রসংস্থার মধ্যে পড়ে ফৌজও, সশস্ত্র লোকের বাহিনী। সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার থাকে যোগাযোগ, পরিবহণের মাধ্যম, বিশেষ অধিষ্ঠান ভবন।

আধুনিক সমস্ত রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রীয় সংস্থার কোনো একটা ব্যবস্থা। তবে এই সমস্ত সংস্থার আসল ভূমিকা, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রণালী,

অর্থাৎ রাষ্ট্রের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপ হয় বিভিন্ন।

শাসনের রূপ হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার সংস্থাগুলির নিজেদের মধ্যে এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সংগঠন। সমস্ত শোষক সমাজের ক্ষেত্রে শাসনের দুটি প্রধান, সর্বাধিক প্রচলিত রূপ দেখা যায়: রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। রাজার (সম্রাট, সুলতান, আমির, মহারাজা, জার) হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে সমস্ত ক্ষমতা, আর তা হস্তান্তরিত হয় উত্তরাধিকার সূত্রে। ঠিক এই আকারে শাসনের এই রূপটা সাধারণত উঠে গেছে। কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রথাটা রয়ে গেছে কোনো কোনো দেশে। সেখানে আইন পাশ করে পার্লামেণ্ট কিন্তু রাজার কাছ থেকে তার অনুমোদন পাওয়া চাই। সরকারের প্রধান হয় সাধারণত শাসক পার্টির নেতা। রাজার থাকে সরকার প্রধানকে, মন্ত্রীদের নিয়োগ করার আনুষ্ঠানিক অধিকার। এই নিয়োগ তিনি করেন লোকসভার সংখ্যাধিক দলের নেতার প্রস্তাব অনুযায়ী। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া রাজার জারি করা কোনো আইন বিধিবদ্ধ হয় না।

প্রজাতন্ত্রের প্রধান দিক হল: ক্ষমতার সংস্থাগুলি নির্বাচনীয় অথবা প্রতিনিধিমূলক; নির্বাচিত সংস্থাদিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশের ভোটে; নাগরিকদের সমান রাজনৈতিক অধিকার সরকারিভাবে স্বীকৃত, আইনের চোখে তারা সবাই সমান।

রাষ্ট্রিক গঠন হল রাষ্ট্রের স্থানিক ও রাজনৈতিক গড়ন, তার অঙ্গাংশগুলির অধিকার, ক্ষমতার কেন্দ্রীয়

ও প্রান্তিক সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রিক গঠনের দুটি প্রধান রূপের কথা জানা আছে: ঐকিক আর ফেডারেটিভ।

ঐকিক রাষ্ট্র হল প্রশাসনিক-আঞ্চলিক বিভাগগুলি নিয়ে অখণ্ড গঠনের রাষ্ট্র। তার সর্বত্র একই সংবিধান, সংস্থাদির একই ব্যবস্থা, তাদের ক্ষমতা গোটা ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত, স্থানীয় সংস্থা কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীন।

ফেডারেটিভ রাষ্ট্র বা ফেডারেশন হল দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সংযুক্তি। তাদের প্রত্যেকের থাকে নিজ নিজ আইন প্রণয়নী, কার্যনির্বাহী, বিচারের সংস্থা। ফেডারেশনের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা সীমিত কেবল ফেডারেল সংস্থাদিতে অর্পিত ক্ষমতা দিয়ে। পার্লামেন্টে সাধারণত থাকে দুটি কক্ষ।

রাজনৈতিক আমল হল শাসন চালাবার যেসব পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তার ব্যবস্থা। কোনো একটা দেশে রাজনৈতিক আমলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্ষমতার এক-একটা সংস্থার অধিকার ও কর্তৃত্ব কতটা ব্যাপক, সামাজিক সংগঠন, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ কেমন, রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে জনমত কিভাবে গ্রাহ্য হয়, সমাজে ব্যষ্টির রাজনৈতিক অবস্থা কেমন, ইত্যাদিতে। বর্তমান বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল দুটি মূল প্রবণতা, যাতে রাজনৈতিক আমল নির্ধারিত। একদিকে একচেটিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আমল প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দমন, মেহনতিদের অধিকার সংকোচনের প্রয়াস, অন্যদিকে, মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক

অধিকার প্রসারের জন্য গণতান্ত্রিক শক্তির, ব্যাপক মেহনতি জনগণের সচেতন অংশের সংগ্রাম।

একদল পুঁজিতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে সরাসরি বলপ্রয়োগের পদ্ধতি প্রধান্য করে, অন্য কতকগুলি দেশে অনুসৃত হয় ছাড় দেবার, আপোসের পদ্ধতি। তবে যেকোনো উপায়ে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বুর্জোয়ারা প্রায়ই উভয় পদ্ধতিই কাজে লাগায়। সর্বক্ষেত্রেই শাসনের রূপ এবং রাষ্ট্রিক গঠনের রূপ থেকে রাজনৈতিক আমলের পার্থক্য হল এই যে তা বেশি সচল, দ্রুত বদলে যেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো হয়, অর্থাৎ মেহনতিদের স্বার্থে মেহনতিদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় মেহনতিদের দ্বারা। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথ যারা নিয়েছে তেমন সমস্ত দেশেই যে এটা বেশ সহজে ঘটে, তা নয়। রূপ লাভের প্রথম পর্যায়গুলিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উৎখাত রাজনৈতিক শক্তিগুলির সরাসরি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল রাষ্ট্রীয় সংস্থাদি গঠনে যারা অংশ নেয়, রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে বাস্তবে প্রভাবিত করে তেমন সমস্ত সংগঠন। তাই রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়াও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে রাজনৈতিক পার্টিগুলিও।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল অভ্যন্তরীণ সমরূপিতা, কেননা সমস্ত সংগঠনই গঠিত খোদ মেহনতিদের নিয়েই। বুর্জোয়া সমাজে আলাদা আলাদা এক-একটা শ্রেণীও ভেতরে

ভেতরে বিভক্ত, তাই এমন সংগঠন দেখা দেয় যা কোনো শ্রেণীর কেবল একাংশের স্বার্থ প্রকাশ করে। যেমন, উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে থাকে বুর্জোয়াদের পৃথক পৃথক স্তরের স্বার্থপ্রকাশক নানা সংগঠন, শ্রমিকদের থাকে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন, তাদের কতকগুলি সংগ্রামমুখী, মেহনতিদের স্বার্থ রক্ষা করে, কতকগুলি আবার স্বাধীনভাবে চলে না, কার্যত মেনে নেয় একচেটিয়াগুলির অভিলাষ।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য ধরে দেশে প্রচলিত পার্টি প্রথা — এক পার্টি, দুই পার্টি, বহু পার্টির অস্তিত্ব। পার্টি বলতে বোঝায় রাজনৈতিক রূপে সংগঠিত লোকেদের এমন গ্রুপ যা সমাজের কোনো না কোনো শ্রেণী বা স্তরের স্বার্থপ্রবক্তা। প্রায়ই ঘটে এই: সমাজ হয় যত খন্ডবিখন্ড, তাতে আপোসহীন বিরোধ থাকে যত বেশি, পার্টির সংখ্যাও তত বাড়ে।

৭। রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র

গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে কী বোঝায়, কী তার নিরিখ, লক্ষণ? প্রথমেই বলে রাখি যে গণতন্ত্রের কোনো সর্বস্বীকৃত অভিধা নেই। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে আর বুর্জোয়া ভাবাদর্শে তার ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রদর্শনেই সীমিত থাকে না, যা প্রায়শই পর্যবসিত হয় রাজনৈতিক জীবনের বাহ্যিক দিকটায়,

তারা মনোযোগ আকর্ষণ করে গণতন্ত্রের সামাজিক মর্মার্থে।

সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলির স্বার্থ যদি হয় বৈরগর্ভ, তাহলে রাষ্ট্রের মতো গণতন্ত্রও শাসক শ্রেণীর স্বার্থ পুষ্ট করে। শোষক রাষ্ট্রে অধিপতি শ্রেণী অধিকাংশের মনে এই মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করে যে বিদ্যমান ব্যবস্থাটাই নাকি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাতে করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার প্রয়াস পায়। কিন্তু কার্যত মেহনতি জনগণ থাকে রাষ্ট্র চালনায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির পার্লামেণ্টে শ্রমিক, কৃষক, নারী সদস্য এক-আধজন, যুব সম্প্রদায়, সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম। আর যেসব দেশে শোষণের অবসান ঘটেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক ন্যায়ের সম্পর্ক, সেখানে ছবিটা একেবারেই অন্যরকম। সমাজতান্ত্রিক দেশের লোকসভায় ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব থাকে সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের, যুবজন সমেত সমস্ত প্রজন্মের লোকেদের। বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক দেশের লোকসভায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকে সমস্ত জাতিসত্তার।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র গোড়ায় ছিল আকর্ষণীয়। রাজনৈতিক মঞ্চে আগত নতুন শ্রেণীটির দাবি ছিল সামন্তদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে চালিত, অত্যধিকাংশ জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হত তাতে। কিন্তু যতই ক্ষমতা আসতে থাকল বুর্জোয়ার হাতে, ততই তারা প্রকাশ ও রক্ষা করতে লাগল সংখ্যাল্পের স্বার্থ।

স্বাধীনতা পরিণত হল অল্পাংশ কর্তৃক অধিকাংশকে পীড়নের স্বাধীনতায়।

গণতন্ত্রের মর্মার্থ প্রতিফলিত হয় সর্বাগ্রে ব্যষ্টিকে প্রদত্ত অধিকার ও স্বাধীনতার চরিত্রে। বুর্জোয়া সংবিধানগুলিতে জোর দেওয়া হয় ব্যক্তিগত মালিকানার অলঙ্ঘনীয়তায়। উৎপাদনের উপায়ের ওপর যদি মালিকানা থাকে, তাহলে নিজের বিবেচনা মতো সেটাকে কাজে লাগাবার অধিকার থাকে লোকের; পরের শ্রম শোষণ করে মুনাফা পেতে, ইজারা দিতে, বিক্রি করতে, টাকাটা লাভজনক অন্য কোনো কারবারে ঢালতে, ইত্যাদি সবকিছুই সে পারে। কিন্তু লোকের যদি থাকে কেবল নিজের দুটি হাত আর মগজ, তাহলে নিজের জন্য কাজ জোটাবার এবং নিজের সামর্থ্য প্রয়োগের অধিকারও থাকে তার। কিন্তু তেমন কাজ দেবার গ্যারাণ্টি বুর্জোয়া রাষ্ট্র দেয় না। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা পাবার স্বাধীনতাও থাকে নাগরিকের। কিন্তু শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের সামর্থ্য না থাকলে এ অধিকার নিতান্ত বাহ্যিক একটা ব্যাপার।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যষ্টির অবস্থা অন্যবিধ। সংবিধানে অধিকার ও কর্তব্যের যে ব্যবস্থা সেখানে বিধিবদ্ধ, তার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস বিকাশের সমস্ত সুযোগ ও প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলা, শ্রমে তার সক্রিয়তা, রাষ্ট্র চালনায় অংশ গ্রহণ, নিজের সংস্কৃতি উন্নয়নে সর্বোপায়ে প্রেরণ দেওয়া। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হল রাষ্ট্র কর্তৃক গ্যারাণ্টিকৃত ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার একটা ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুর্জোয়া রাষ্ট্র

১। একচেটিয়ার স্বার্থরক্ষক

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে নির্ধারক ভূমিকা নেয় বড়ো বড়ো একচেটিয়া কারবার, ব্যাঙ্ক, কনসার্ন, ট্রাস্ট, কর্পোরেশনগুলি স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করে দেশের সম্পদের মূলাংশটা, আধিপত্য করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তাই রাষ্ট্র সর্বাগ্রে রক্ষা করে একচেটিয়া বুর্জোয়ার স্বার্থ, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাহারায় থাকে আর মেহনতিরা খেটে যায় মুষ্টিমেয় শোষকের ধনবৃদ্ধির জন্য। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাজকর্ম চলে অবিরাম রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিস্থিতিতে। মেহনতি আর একচেটিয়াগুলির মধ্যে স্বার্থের বৈপরীত্য, একদিকে একচেটিয়া আর অন্যদিকে মাঝারি বুর্জোয়া, শহরের মাঝারি স্তর, পেটি-বুর্জোয়া স্তর, বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থবিরোধ দিয়ে

নির্ধারিত হয় পুঁজিতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখা ও সুদৃঢ় করার জন্য একচেটিয়া বুর্জোয়ার প্রয়াস এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষা, সত্যি করেই সেগুলির পরিপূর্ণতা যাতে বাড়ে, তার জন্য মেহনতিদের সংকল্পে দেখা দেয় দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা: জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার হামলা আর গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য অগ্রণী শক্তিগুলির সংগ্রাম বৃদ্ধি। নির্দিষ্ট দেশ ও নির্দিষ্ট কালে এই প্রবণতার বাস্তব আত্মপ্রকাশ হয় বিভিন্ন। শ্রেণী বৈর, বিরোধ মাঝে মাঝে বুর্জোয়াকে বাধ্য করে নতি স্বীকারে, রাজনৈতিক মহড়া নিতে। পুঁজিতান্ত্রিক বিরোধগুলি চাপা দিতে গিয়ে শাসক ওপরতলা শ্রেণী সংঘাত সংযত রাখার চেষ্টা করে: অর্থনৈতিক সংকটের ফলাফল নরম করে আনে, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, ইত্যাদি কমায়।

বিগত দশকগুলিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সামাজিক সম্পর্ক নিয়মনে চেষ্টিত। মালিক — মজুর শ্রম সম্পর্কের খানিকটা সুব্যবস্থায়, বেতন, পেনসন, কাজের ঘণ্টার প্রশ্ন মীমাংসায় অংশ নিচ্ছে, চেষ্টা করছে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের প্রক্রিয়াটা থামাতে। স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়া, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, বৈজ্ঞানিক সংগঠন স্থাপনও পড়ে তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। এক-একটা দেশে রাষ্ট্রের সামাজিক কাজকর্মের মাত্রা এক-একরকম।

তবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে

'আহামরি' করে তোলা উচিত নয়। নিজেদের অধিকারের জন্য মেহনতিদের সংগ্রাম যে থামছে না, সেটা অকারণে নয়: এই ধরনের আংশিক ছাড়ে সে দাবি মেটার নয়। এবং সেটা বোধগম্য। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তার শ্রেণী মর্মার্থের বিরোধী নয়, বরং বুর্জোয়ার সুনির্দিষ্ট একটা সামাজিক-রাজনৈতিক লক্ষ্যই তা অনুসরণ করে — নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সামাজিক পলিসি নির্ধারিত হয় বিশ্বে এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটিতে শ্রেণী শক্তির অনুপাত দিয়ে, সেটা তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, এবং অনুসরণ করে পুঁজিতন্ত্রের বনিয়াদ টিকিয়ে রাখার জন্য।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাকা করার মূল লক্ষ্য নিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির পরিচালক, তাতে করে পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক সম্পর্কাদির পুনরুৎপাদনে তা সরাসরি অংশ নেয়। এইসব সম্পত্তি চালায় এমন লোকেরা একচেটিয়াগুলির সঙ্গে যারা নিবিড়ভাবে জড়িত। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে। কেন সেটা ঘটে? কেননা সাধারণত মেহনতিদের আছে ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন। নিজেদের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে বৈধ ও প্রথাসিদ্ধ করার অধিকার অর্জন করেছে তারা। শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিতে নিজেদের দালাল আর চরও পাঠায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা, প্রগতিশীল কর্মীদের পেছনে টিকটিকি লাগায়, টেলিফোন কথাবার্তা শোনার জন্য আড়ি পাতে।

জনসাধারণের ব্যাপক স্তরকে ভাবাদর্শের দিক থেকে

দলাই-মলাই করে তোলায় জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা না থাকলে বর্তমান যুগে বুর্জোয়া ক্ষমতা সুস্থায়ী হয় না। সে উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় গণ সংবাদের মাধ্যম — খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি। ভাবাদর্শীয় ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত প্রধান প্রধান আংটা।

আত্মসংরক্ষণের জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র অনুসরণ করে সামরীকরণের পলিসি। তার মূলে থাকে কেবল অন্যান্য দেশ প্রসঙ্গে আগ্রাসনী পরিকল্পনাই নয়, দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী অভিযান দমনের প্রবল একটা উপায় হাতে রাখারও প্রয়াস। এমন একটা ভীতিপ্রদ শক্তি বিনা লক্ষ লক্ষ মেহনতির অসন্তোষ সংযত রাখা কঠিন। আতঙ্কের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি বুর্জোয়াদের পক্ষে লাভজনক, এতে আগামী দিনের অনিশ্চয়তায় লোকে থাকে ভয়ে ভয়ে, শক্তিশালীর নিকট বশ্যতার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।

২। ক্ষমতার যন্ত্রব্যবস্থা

রাষ্ট্রক্ষমতা খাটানো হয় রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ এবং বেসরকারি সংগঠনাদির একটা ব্যবস্থা মারফত।

শাসনের রূপ। আধুনিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রগুলি হয় রাষ্ট্রপতিমূলক এবং পার্লামেণ্টী। রাষ্ট্রপতিমূলক প্রজাতন্ত্রে সরকার বা মন্ত্রিসভা গঠন করেন প্রেসিডেণ্ট, সরকার জবাবদিহি করে তাঁর কাছে। প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছায় সরকারের গঠনে যেকোন অদলবদল করা যায়।

প্রেসিডেণ্ট নিজে নির্বাচিত হন সরকার থেকে স্বাধীনভাবে।

পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্রে পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে প্রধান মন্ত্রী গঠন করেন সরকার যা জবাবদিহি করে পার্লামেণ্টের কাছে। সরকারের কর্মসূচি অনুমোদিত হওয়া চাই অধিকাংশ দ্বারা, পার্লামেণ্ট অনাস্থাসূচক ভোট দিলে সরকার হয় পদত্যাগ করে নয় পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিতে অনুরোধ করে প্রেসিডেণ্টকে।

রাষ্ট্রিক-ভূভাগীয় গঠন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐকিক গঠনের প্রাধান্য। বুর্জোয়া ফেডারেশন কিন্তু বিশ্বের একসারি দেশে বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাট বিকাশের ফল। ফেডারেটিভ বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আঞ্চলিক বিকাশের অসমানতা বিলুপ্ত হয় না, অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান সমান করে তুলতে, জাতীয় প্রশ্নের সমাধান করতে তা চেষ্টিত নয়। জাতি ও জাতিসত্তাগুলির আঞ্চলিক অধিবাস আদৌ গণ্য করা হয় না রাষ্ট্রের ফেডারেটিভ সংগঠনে। বুর্জোয়া ফেডারেশনগুলি বর্তমান পরিস্থিতিতে সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে, যা প্রকাশ পাচ্ছে সর্বাগ্রে কেন্দ্রীকরণের বৃদ্ধিতে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে দেখা যায় মূলগতভাবে দুই ধরনের রাজনৈতিক আমল: বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আর কর্তৃত্বপ্রধান।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আমলের বৈশিষ্ট্য হল সংবিধানে বিধিবদ্ধ এবং কার্যক্ষেত্রে অংশত অনুসৃত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা, বিরোধী

সমেত একাধিক রাজনৈতিক পার্টি, গণচরিত্রের সামাজিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ তাতে অনুমোদিত। প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাদি গড়ে ওঠে সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে, অধিকাংশ মেহনতির ভোটাধিকার থাকে।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আমলকে আদর্শ বলে গণ্য করা অনুচিত — শোষণ বজায় রাখার সঙ্গে তা খাপ খায়, তাই দেখা দেয় গণতান্ত্রিক নীতিগুলি সংকোচনের প্রবণতা। রাষ্ট্রযন্ত্র স্ফীত হচ্ছে, ক্রমেই জুড়ে যাচ্ছে একচেটিয়া কারবারগুলির সঙ্গে। একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা স্থানলাভ করে সরকারেও, মন্ত্রকগুলিতেও। অন্যদিকে আবার পেশাদার রাজনীতিকদের প্রায়ই থাকে বড়ো বড়ো কোম্পানিতে একগোছা করে শেয়ার। রাষ্ট্রীয় পদ থেকে অবসর নিয়ে তারা মোটা টাকার কাজ পায় ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট, কর্পোরেশন, প্রভৃতিতে। একচেটিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের এই জুড়নে গড়ে ওঠে প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের সংযুক্তি হল একচেটিয়া আর ফৌজের ওপরতলার জোট — সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স।

রাষ্ট্রযন্ত্রের বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হচ্ছে লোকসভার ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র সীমিত করার জন্য একচেটিয়া বুর্জোয়ার প্রয়াস। সেটা প্রকাশ পাচ্ছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পার্লামেণ্টের আইনপ্রণয়নী এক্তিয়ার সরাসরি সংকোচন এবং সরকারের আইন জারির অধিকারের সাংবিধানিক সংশোধনে, সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে সীমারোপে, যাতে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকার

হয়ে দাঁড়ায় অনেক স্বাধীন। অন্য কথায়, কর্তিত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলিকেও বিলুপ্ত করা, পার্লামেণ্টের ভূমিকা সীমিত রাখা, সংবিধানে পরিবর্তন ঘটিয়ে একচেটিয়ার পেটোয়াদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, পার্লামেণ্ট প্রথা থেকে কোনো না কোনো ধরনের একনায়কত্বে চলে আসার জন্য সবকিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা।

অধিকাংশ বুর্জোয়া রাষ্ট্র যে পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপও নিয়ন্ত্রণ করছে, তাতেও প্রকাশ পাচ্ছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আমলকে সংকুচিত করার প্রবণতা। তাদের কাছে অবাঞ্ছিত পার্টিগুলিকে রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ থেকে হটাবার অধিকার রাখছে রাষ্ট্র, পার্টির রেজিস্ট্রেশন, অর্থ সংস্থানের খবর, ইত্যাদি দাবি করছে।

কর্তৃত্বপ্রধান আমলের বৈশিষ্ট্য হল সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতার আংশিক বা সামূহিক অভাব; গণতান্ত্রিক পার্টি ও মেহনতি সংগঠনাদির ক্রিয়াকলাপ নিষেধ, প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রীয় সংস্থাদি নির্বাচনের সুযোগ হ্রাস, রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। এই ধরনের আমলের চরম রূপ হল ফ্যাসিজম।

ফ্যাসিজম কেবল অতীতের একটা ব্যাপার নয়। অল্পসংখ্যক হলেও নয়াফ্যাসিস্ট সংগঠন রয়েছে বহু পুঁজিতান্ত্রিক দেশে। সামরিকতার মাতনে ফ্যাসিস্ট সমেত দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টিগুলির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য হচ্ছে। নয়াফ্যাসিজমের বৈশিষ্ট্য হল নিজেদের সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত করার প্রয়াস। নয়াফ্যাসিজমের

বৃদ্ধি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতির প্রবলতা, পুলিসি দমননীতির বৈধ ভিত্তির প্রসার, শ্রমিকবিরোধী, জনবিরোধী আইন প্রণয়নের সহায়ক।

৩। রাজনৈতিক পার্টি

রাষ্ট্রের পর রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান প্রতিষ্ঠান হল পার্টি। পার্লামেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি গঠন, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন চলে পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে। লোকসভা সদস্য, প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রার্থী পেশ করে তারা, নির্বাচনী অভিযান নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়। বুর্জোয়া পার্টিরাই স্থির করে শাসক শীর্ষে কারা থাকবে জনমত গঠন আর ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের হাতিয়ার হল পার্টি।

পার্টি ব্যবস্থা হয় একাধিক: এমন বহুপার্টি ব্যবস্থা হয় যেখানে লোকসভায় একান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে বুর্জোয়া পার্টিগুলির একটির; বহুপার্টি ব্যবস্থা, যেখানে প্রাধান্যকারী বুর্জোয়া পার্টি নেই; দ্বিপার্টি ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক মঞ্চে কেবল দুটি পার্টির সুস্থায়ী প্রাধান্য; এক পার্টি ব্যবস্থা, যেখানে সরকারিভাবে কেবল একটি পার্টি অনুমোদিত, অন্যান্য পার্টি নিষিদ্ধ।

পার্টি ব্যবস্থা পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক গঠনের হুবহু প্রতিফলন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পার্টি প্রকাশ করতে পারে গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীর নয়, তার কেবল এক-একটা গ্রুপ আর সেইসঙ্গে কিছু মধ্যবর্তী

স্তরের স্বার্থ। তেমন পার্টিও হতে পারে যা একই সময়ে কতিপয় শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের স্বার্থ প্রকাশ করছে বলে দাবি করে। তাই পার্টির সত্যকার মর্ম স্থির করা সহজ হয় না। সেটা আরো এই কারণে, যে অনেক পার্টি তাদের উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখে, নিজেদের ক্রিয়াকলাপ চালায় জাতীয়তাবাদী ধ্বনি, ধর্মীয় জিগির দিয়ে।

পার্টির ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য ও মূল ধারা নির্ণয় করতে হলে বিচার করতে হবে '...পার্টি নিজের সম্পর্কে কী বলছে, সেটা তত নয়, কী তারা **করছে,** বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিভাবে তারা চলছে, জমিদার, পুঁজিপতি, কৃষক, ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কী **তাদের আচরণ**।'* পার্টি মূল্যায়নের এই মানদণ্ড দিয়েছেন ভ. ই. লেনিন।

বুর্জোয়া পার্টি। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে থাকে একচেটিয়া বুর্জোয়া, মাঝারি আর পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি। তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে যে যে স্বার্থের তারা ধারক তার চরিত্রে, সংগঠনশীলতা, লক্ষ্যের সুনির্দিষ্টতার মাত্রায়, ক্ষমতার প্রতি তাদের মনোভাব, তা ব্যবহারের পদ্ধতিতে। যেমন, একচেটিয়া বুর্জোয়ার পার্টিগুলির মধ্যে এমন পার্টি থাকে যাদের কোনোটা সংগঠনের দিক থেকে সাকার, কোনোটা নিরাকার। শেষোক্তগুলিতে আনুষ্ঠানিক কোনো সদস্য নেই, সদস্য

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 18, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 45.

চাঁদা ও পার্টি কার্ডের ব্যবস্থা থাকে না, কিন্তু থাকে বেশ ছড়ানো পার্টিযন্ত্র, পার্টির কর্মনির্বাহকেরা। একচেটিয়া পুঁজির পার্টির পক্ষে টিপিক্যাল হল বিশ্ববীক্ষা, কর্মসূচির অস্পষ্টতা, সেটা অকারণে নয়। সাংগঠনিক ও ভাবাদর্শীয় অস্পষ্টতার আড়ালে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায় পার্টির সামাজিক মর্ম। তাছাড়া কেবল পুঁজির হোমরা-চোমরাদের নিয়ে পার্টি রাখায় একচেটিয়া বুর্জোয়ার কোনোই আগ্রহ নেই, সেটা হবে খুবই সংকীর্ণ একটা মহল। তাই অন্যান্য পার্টির বিপদ-আপদ, ভুলভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে নির্বাচনে সমস্ত স্তরের অসন্তুষ্টদের ভোট বাগাবার চেষ্টা করে তারা।

ক্ষমতা ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসারে বুর্জোয়া পার্টিরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আর কর্তৃত্বপরায়ণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমোক্তরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির কাঠামোর মধ্যে; দ্বিতীয়েরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি (নির্বাচন প্রথা, ক্ষমতা বিভাগ, ভূভাগীয় ইউনিটগুলির স্বশাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ইত্যাদি) মানে না, 'শক্তিশালী' শাসন প্রতিষ্ঠাই নিজেদের লক্ষ্য বলে ধরে। এই ধরনের পার্টির ভিত্তিতে থাকে বর্ণবাদী, জাতিবাদী, নয়াফ্যাসিস্ট ভাবাদর্শ, যা বলপ্রয়োগের পূজারী। এরূপ পার্টি রয়েছে কার্যত সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই। অবশ্য এগুলির সভ্যসংখ্যা বেশি নয় এবং বর্তমানে উন্নত কোনো পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই একটা প্রবল রাজনৈতিক শক্তি নয় তারা। কিন্তু এইসব ফ্যাসিস্টপন্থী সংগঠনের দুর্মরতায় প্রশ্রয় দিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সর্বদাই

প্রতিক্রিয়াশীল প্রখর বৃদ্ধির একটা সুযোগ হাতে রাখে। প্রতিক্রিয়াশীল সক্রিয়তা দেয় অন্য একটা রাজনৈতিক বিকাশের 'ভিত্তি' বা অজুহাত: সামরিক কু'দেতা, মেহনতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার দমন, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সঙ্গে নির্মম সংগ্রাম।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করে। যারা সোজাসুজি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহক, সাধারণত তারা দক্ষিণপন্থীদের দলে পড়ে, নয়ারক্ষণশীলতার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ধারাটার প্রতিমূর্তি তারা, বড়ো বড়ো পুঁজিতান্ত্রিক দেশে তারাই থাকে ক্ষমতায়। এই ধরনের পার্টি কোনো একটা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কারের ঘোর বিরোধী।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির মধ্যে কেন্দ্রপন্থীরাও থাকে, যাদের প্রায়ই বলা হয় উদারনৈতিক। সাধারণত তারা প্রকাশ করে পেটি বুর্জোয়ার মাঝারি স্তরগুলির স্বার্থ। কোনো কোনো প্রশ্নে তারা একচেটিয়ার জবরদস্তির বিরোধিতা করতে পারে এবং তাতে করে একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামে হতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী। তাদের অবস্থান প্রায়ই দোলায়মান, যোগ দিতে পারে তারা কখনো দক্ষিণপন্থী, কখনো বামপন্থীদের সঙ্গে।

পার্টিগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ভেদাভেদ হিসেবে রাখা কেন দরকার? বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক যে পার্টিই সরকার গঠন করুক না কেন, তা তো পুঁজিতন্ত্রেরই সেবা করবে। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্র কিভাবে কাজ চালাচ্ছে

তাতে গণতান্ত্রিক শক্তিদের কিছু এসে যায় না এমন নয়। তাই কমিউনিস্টদের, সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির উচিত প্রতিক্রিয়াশীল নয়াফ্যাসিস্ট পার্টিদের ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া, তাদের গণতন্ত্রবিরোধী স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

বুর্জোয়া পার্টিদের যদিও থাকে পুঁজির স্বার্থ রক্ষার কার্যকরী যন্ত্রব্যবস্থা, সরকারে বৃহৎ কারবারের সরাসরি প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে তারা, তাহলেও বুর্জোয়ার থাকে রুদ্ধদ্বার, শ্রেণী সম্পর্কের দিক থেকে একেবারে সমধর্মী অন্যান্য সমিতি। এই ধরনের সংগঠন রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর বিপুল, প্রায়ই নির্ধারক প্রভাব ফেলে, কার্যত এগুলি হল প্রচ্ছন্ন মন্ত্রিসভা। বুর্জোয়াকে সাধারণ জাতীয় পরিসরে ঐক্যবদ্ধ করা এই সংগঠনগুলি হল একচেটিয়া বুর্জোয়ার ক্ষমতার কোষকেন্দ্র।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের একটি মূলাঙ্গ হল রাজনৈতিক উচ্চকোটি — রাষ্ট্র, পার্টি, সামাজিক সংগঠনাদির নেতা সৃষ্টি ও অবিরাম পুনঃসৃষ্টি। রাজনৈতিক উচ্চকোটির সঙ্গে যোগ দেয় আমলাতান্ত্রিক উচ্চকোটি — রাষ্ট্রিক, সামরিক, ভাবাদর্শীয় যন্ত্র। এটা গড়ে ওঠে একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিদের নিয়ে, অংশত অন্য গোষ্ঠীর লোকও থাকে যদি তারা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বস্ততার মোনোত্তীর্ণ হয়। সমগ্রভাবে রাজনৈতিক উচ্চকোটি একটি রুদ্ধদ্বার গ্রুপ।

একাধিক পার্টি ব্যবস্থা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আমলের বৈশিষ্ট্যসূচক কেন? প্রধান কারণ, বুর্জোয়া

সমাজ শ্রেণী ও স্তরে বিভক্ত, যাদের স্বার্থ সরাসরি বিপরীত। তদুপরি খোদ বুর্জোয়ারাও সমগোত্রীয় নয়। একচেটিয়া, বৃহৎ এবং সাঝারি বুর্জোয়ার স্বার্থ বহু দিক থেকে শুধু মিলে যায় না তাই নয়, এমনকি বিরোধিতাই দেখা দেয় তাতে।

বুর্জোয়া জীবনধারার এইসব বৈশিষ্ট্যও দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার কারণ, যথা: ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কের আধিপত্য জনিত বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক বিবিক্তি, তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ঘোঁট, প্রাতিষ্ঠানিকতার দিকগুলির বৃদ্ধি। ঐতিহ্য, পেটি-বুর্জোয়া স্তরগুলির ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে, বহুপার্টি ব্যবস্থা দেখা দেয়। যেখানে পেটি-বুর্জোয়া স্তরগুলি বড়ো একটা রাজনৈতিক ভূমিকা নেয় না, পার্টির সংখ্যা সেখানে সাধারণত কম। রাজনৈতিক ধ্বনির বৈচিত্র্য যেখানে বেশি, পার্টিও সেখানে বেশি। জাতীয়, ধর্মীয় বিভিন্নতার দরুনও বহুপার্টি ব্যবস্থা দেখা দেয়।

বহুপার্টি ব্যবস্থা একচেটিয়া বুর্জোয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেরও সহায়ক। বিরোধ ও সংঘাত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এতে তারা একটা নমনীয় চালের সুযোগ পায়। নতুন শাসক কোআলিশন, পার্লামেন্টে শক্তির পুনর্বিন্যাস, নেতাদের অদলবদলে জনগণের মনে মোহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, উন্নত ভবিষ্যতে আশা জাগে, তাতে করে রাজনৈতিক বিরোধের উত্তাপ হ্রাস পায়, ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বাড়তে পায় না।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আর কমিউনিস্ট এই দুই ধরনের পার্টির অস্তিত্ব শ্রমিক

শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির উদ্ভব হয় গত শতকেই। এ পার্টির দীর্ঘ ঐতিহ্য, একসারি দেশে তাদের প্রভাব শ্রমিক শ্রেণীর বড়ো একটা অংশে প্রসারিত। এ পার্টিগুলির একাংশ তাদের সদস্যদের দিক থেকে বহুদিন হল আর শ্রমিক নয়, তাদের সামাজিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পেটি-বুর্জোয়া, মধ্যস্তরগুলি। কিন্তু ব্যাপারটা কেবল, এমনকি প্রধানত তাদের সামাজিক বিন্যাস নিয়ে নয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি পৃথক পৃথক এক-একটা সংস্কারের কর্মসূচি নিয়েছে, বুর্জোয়া সমাজের আমূল বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে তারা। সমাজতন্ত্রীদের আপোস নীতিতে সমগ্রভাবে বিপন্ন হয় না বুর্জোয়া ব্যবস্থার বনিয়াদ। সেই কারণে এক-একটা দেশে একচেটিয়া তাদের নেতৃত্বে অথবা পুরোপুরি তাদের দ্বারা সরকার গঠন মেনে নেয়। সেইসঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের পঙ্‌ক্তিতে প্রভাবশালী বামপন্থী শক্তি গড়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবল একটা সংগঠন। একচেটিয়াও মনে রাখে সেরকম সম্ভাবনার কথা। তাই অবস্থাচক্রে যদি পারা যায়, তাহলে দক্ষিণপন্থী শক্তিরা হটিয়ে দেয় সমাজতন্ত্রীদের, সরকার গঠনে অংশ নেবার সুযোগ তাদের দেয় না।

কমিউনিস্ট পার্টি — শ্রমিক শ্রেণী, সমস্ত সচেতন মেহনতির সঙ্গতিপরায়ণ বৈপ্লবিক সংগঠন। কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ

এবং শোষণ উদ্ভবের কারণগুলির উচ্ছেদ। সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি অবিরাম আপোসহীন সংগ্রাম চালায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকেও সে কাজে লাগায়। যেখানে সামরিক, কর্তৃত্বপরায়ণ আমলের আধিপত্য, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি দমিত, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। যে পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি অপেক্ষাকৃত সুস্থায়ী অথচ বামপন্থী শক্তি দুর্বল সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিকে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয় না।

যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ সংকুচিত বা নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয়, সেখানে একচেটিয়া চেষ্টা করে তাদের রাজনৈতিক দিক থেকে একঘরে করে রাখার। বৃহৎ পুঁজির পার্টিগুলি কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। ব্যাপক সংবাদ-মাধ্যমগুলি দিয়ে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য, সংগ্রামের পদ্ধতি সম্পর্কে বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করা হয়, কমিউনিস্টবিরোধী গালগল্প ছড়ায়। এসবের প্রভাব পড়ে বামপন্থী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিদের ক্রিয়াকলাপের ওপর। প্রায়ই তারা কমিউনিস্টদের চেয়ে বরং দক্ষিণপন্থী পার্টিদের সঙ্গে জোট বাঁধতে চায়। কমিউনিস্টদের পক্ষে কোনো কোনো প্রশ্নে অন্য পার্টির সঙ্গে সমঝোতায় আসার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ করার পলিসি অনুসৃত হয় সেইসব বুর্জোয়া রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের হাত করে এমনকি হত্যা করেও, যারা বাস্তবতাবোধ দেখায় এবং কমিউনিস্ট

পার্টির বিপুল প্রভাব থাকলে তার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় খোঁজে।

অতি সুকঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা হাল ছাড়ে না, সক্রিয় কাজ চালায়, পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে জমায়েত করে শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে।

৪। মুখের কথা আর বাস্তব অবস্থা

সমতার নীতিটা কার্যক্ষেত্রে আসলে কেমন? অধিকার ও স্বাধীনতার লম্বা তালিকায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানে সাধারণত ঘোষিত হয় সমতার একটি সাধারণ নীতি। সমতার ব্যাখ্যা করা হয় আইন, প্রশাসনিক ক্ষমতার সমক্ষে, ট্যাক্স প্রদানে, অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগে সমতা। তবে সমান অধিকার থাকলেই সমতা বোঝায় না। শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সমাধিকার অসাম্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। কোথায় সমতা যেখানে অসমাজতান্ত্রিক জগতের প্রায় ৫০% লোক অপুষ্টিতে ভুগছে, ১০ কোটির বেশি লোক বেকার। সামাজিক প্রয়োজনে বরাদ্দ অর্থ কার্যত অভাবগ্রস্তদের চেয়ে ধনীদেরই কাজে লাগে বেশি। পরিণামে, জাতীয় সম্পদের যে অংশটা যায় সমৃদ্ধ লোকেদের ভাগে, তা ক্রমাগত বাড়ছে আর যেটা যায় নিঃসম্বলদের কাছে, তা কমছে।

ফলত, বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের মূলনীতি — সমতা — একটা বাহ্যানুষ্ঠান কেননা সর্বোত্তম ক্ষেত্রে তা আইনী

সমাধিকার এবং সেদিক থেকেও সেটা পূর্ণ নয়, তার পাকা গ্যারাণ্টি নেই। রাষ্ট্র অধিকার ও স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়, এই নিয়ে বিস্তর গলাবাজি থাকে বুর্জোয়া সংবিধানে, কিন্তু কেমন করে কী উপায়ে তা গ্যারাণ্টিকৃত হচ্ছে, তার উল্লেখ থাকে না। বাস্তব গ্যারান্টি থাকে তার যার আছে সঙ্গতি, তার ওপর নির্ভর করতে পারে। আইনে গ্যারাণ্টি আছে অধিকার সরাসরি লঙ্ঘিত হলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল শ্রমের অধিকার আদালত কিভাবে নিশ্চিত করবে যেখানে কর্মপ্রার্থীর চেয়ে কর্মের সংখ্যা কম। বাক্‌স্বাধীনতা কিভাবে নিশ্চিত হবে যেখানে ব্যাপক সংবাদ-মাধ্যমের কেবল মালিকেরাই সেটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে?

গণতান্ত্রিক শক্তিদের নিকট নতি স্বীকার করে বুর্জোয়া মাঝে মাঝে তেমন অধিকার ও স্বাধীনতাও সংবিধানভুক্ত করতে রাজি হয় যা চিরাচরিত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক নীতি ছাড়িয়ে যায় (যেমন, শ্রমের অধিকার, উদ্যোগ পরিচালনায় অংশগ্রহণ, রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয়করণের অধিকার)। তবে এইসব শর্ত থেকে যায় ন্যূনাধিক ফাঁকা কথা। যেমন, ইতালির সংবিধানে সকলের শ্রমের অধিকার ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কী দাঁড়াল? ইতালি সংখ্যাবহুল বেকারবাহিনীর একটা দেশ। তাই প্রথম দৃষ্টিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রীতিমতো গণতান্ত্রিক সংবিধানও তার সামাজিক প্রকৃতি বদলায় না।

সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা।

অধিকার ও স্বাধীনতার সমস্যা প্রসঙ্গে বুর্জোয়া লেখকেরা সাধারণত শুরু করে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে অর্থাৎ সেইসব অধিকার যা ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা ছাড়া লোকে বাঁচতে এবং খাটতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্রেফ ঘোষণাটুকুর কোনো মানে হয় না। যেমন, বাসগৃহের অলঙ্ঘনীয়তার কী অর্থ হয় তাদের কাছে যাদের বাসগৃহই নেই। কিংবা আদালত দ্বারা আত্মরক্ষার সাংবিধানিক অধিকার মেহনতিদের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় এক অলীকতা, কেননা উকিলের ফি দেবার টাকা থাকে না তার পকেটে। তাই প্রধান কথা হল সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা: যেকোনো সমাজের মর্মার্থ তাতে প্রকাশ পায় সবচেয়ে স্পষ্ট করে। বুর্জোয়া সমাজে তার চরিত্র এই দিয়ে নির্ধারিত যে লোকেরা শোষক আর শোষিত, মালিক আর মজুরি-খাটা মেহনতিতে বিভক্ত।

কোনো কোনো বুর্জোয়া সংবিধানে শ্রমের অধিকার যে স্বীকৃত হয়েছে সেটা মেহনতিদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার একরোখা সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলে। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো সংবিধানে এই কর্তব্যও বিধিবদ্ধ হয়েছে যে সবাইকেই খাটতে হবে। ঘোষিত হয়েছে শ্রমের স্বাধীনতা; পেশা নির্বাচন, কাজ, কাজের স্থায়িত্ব, ন্যূনতম বেতনের অধিকার। তবে এ সবই নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থাচক্রের ওপর এবং কিছু দিয়েই এগুলি গ্যারান্টি করা নয়। উল্লেখযোগ্য যে

১৯৮০ সালে জাতিসঙ্ঘের যে প্রস্তাবে বলা হয় যে মানব অধিকার এবং মানব মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধার পূর্ণ গ্যারান্টির জন্য প্রয়োজন শ্রম, পরিচালনায় মেহনতিদের অংশগ্রহণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সাহায্য পাবার অধিকারের গ্যারান্টি এবং যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক, তেমনি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় একইরকম মনোযোগ অর্পণ প্রয়োজন, মার্কিন প্রতিনিধিদল তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

মেহনতিদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জয়লাভের মধ্যে পড়ে বিশ্রাম, বেকার ভাতা, বার্ধক্য পেনশন, নারী ও শিশু শ্রম রক্ষার অধিকারও। কিন্তু মেহনতিদের অবস্থা তাতে পুরো লঘুভার হয় না। যেমন, বেকারি ভাতা সবাই যে পায়, মোটেই তা নয়। একরাশ শর্ত, দক্ষতার দাবি থাকে তাতে। ফলে দাঁড়ায় যে বেকারি ভাতার প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশি, তারাই তা থেকে বঞ্চিত।

প্রত্যেকের চিকিৎসা পাবার অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুনিশ্চিত না হলে অন্য সমস্ত অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে বহু লোকের ক্ষেত্রে এটা একটা অনায়ত্ত বিলাস কেননা ডাক্তারের ফি ক্রমাগত বাড়ছে। গ্রেট ব্রিটেনে মেহনতিরা বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার লাভ করতে পেয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাস্তবে সবাই সে অধিকার ভোগ করতে পারছে। রক্ষণশীল সরকার হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ও চিকিৎসক হ্রাসের পলিসি নিয়েছে, বন্ধ করা হচ্ছে হাসপাতাল। ফলে জরুরি চিকিৎসা, জরুরি

অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষমাণদের তালিকা হয়ে চলেছে লম্বা।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে শিক্ষালাভের অধিকার নেই (থাকলে, শ্রমের অধিকারের মতো সেটাও হত অবাস্তব), কিন্তু আছে শিক্ষাদানের অধিকার। তার মধ্যে পড়ে অবাধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, স্কুল নির্বাচনের স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্কুল রয়ে যাওয়া এ স্বাধীনতার একটা কারণ), একাডেমিক স্বাধীনতা, শিক্ষাসূচির স্বাধীনতা। কিন্তু শিক্ষালাভের অধিকার ছাড়া এগুলি কেবল উচ্চকোটির অধিকার, কেননা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিকাংশের ক্ষেত্রেই একটা বিরল সৌভাগ্য। অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাই কেবল বিনামূল্যে।

বাসগৃহের কোনো গ্যারান্টি দেয় না বুর্জোয়া রাষ্ট্র। চড়া বাড়িভাড়া আর ক্রমাগত বর্ধমান গৃহমূল্য হল বাস্তবতা। কাঙালদের নিরাশ্রয়তা আর সবরকম সুবিধা সমেত শত শত বাড়ি খালি পড়ে থাকা, এই হল বুর্জোয়া জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য।

রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে নাগরিকের ভোটাধিকার থাকে, এতে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাদিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় সে। তবে এটা কেবল বাহ্যিক অধিকার। ব্যাপক সংবাদ-মাধ্যমের বিশাল যন্ত্রের সাহায্যে বুর্জোয়ারা কায়দা করে জনমতকে নিজেদের কাজে লাগায়।

আসলে কারা নির্বাচিত হয় এবং কার্যক্ষেত্রে কার

স্বার্থ তারা দেখে সেটা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত তথ্যে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ জন সিনেটারের মধ্যে ২৫ জন কর্পোরেশনগুলির সভাপতি, ডিরেক্টার কিংবা অন্যতম মালিক, ৩৬ জন ব্যাঙ্ক আর বীমা কোম্পানির মোটা শেয়ারধারী, ৩১ জনের লগ্নি আছে তেল আর গ্যাস শিল্পে, ৪৭ জন অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবসায়ে লিপ্ত ইত্যাদি। অধিকাংশ সিনেটার কর্পোরেশনগুলির কাছ থেকে বক্তৃতা, পরামর্শাদির সম্মানী হিশেবে টাকা পায়।

বুর্জোয়া সংবিধান বা নির্বাচনী আইনে এমন শর্ত নেই যে মাত্র অনপেক্ষ অধিকাংশ ভোট পেলেই প্রার্থী নির্বাচিত বলে গণ্য হবে এবং প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে অধিকাংশ ভোট পড়া চাই। বুর্জোয়া প্রথায় যে পরিমাণ ভোটই পড়ুক না কেন, নির্বাচন বৈধ বলে ধরা হয় আর আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য (অর্থাৎ অন্যান্য প্রার্থীদের চেয়ে বেশি) পেলেই তাকে গণ্য করতে হবে 'জনগণের নির্বাচিত' বলে। বুর্জোয়া চরিত্রের ভোটাধিকারের প্রতিক্রিয়া হিশেবেই দেখা দিয়েছে নির্বাচনে ব্যাপক অনুপস্থিতি।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানে বাক্ স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীনতা, সমিতি গড়ার স্বাধীনতা অনুমোদিত। কিন্তু প্রতিটি দেশেই এমন একসারি সংকোচন আর শর্ত থাকে যাতে এ অধিকার কার্যক্ষেত্রে পর্যবসিত হয় নিষ্ফলতায়। বুর্জোয়া স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যই হল ব্যাপক অধিকারের সাংবিধানিক ঘোষণা

আর বলবৎ আইন দ্বারা সে অধিকারের কার্যত সংকোচন।

অনেক পুঁজিতান্ত্রিক দেশে মেহনতিদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ: রাজনৈতিক ধর্মঘট নিষিদ্ধ, ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ নানা বাধানিষেধে সঙ্কুচিত, অর্থনৈতিক ধর্মঘটও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র ক্রমেই পার্টিগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রসারের চেষ্টা করছে। পার্টি ক্রিয়াকলাপের সমস্ত দিকে, তার তহবিলের উৎস, পার্টির গঠন, ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য, ইত্যাদির ওপরেও চেপে বসছে রাষ্ট্রীয় নিয়ামন। কতকগুলি সংবিধানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার অনুমোদন আছে যখন মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হয় সংকুচিত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হয় সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর।

বিবেকের স্বাধীনতাকে চিরাচরিত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক নীতি বলে ধরা হয়। এ নীতি দেখা দিয়েছিল ধর্মের জবরদস্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রথম দিকে তাতে ছিল ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না করার অধিকার। এখন বিবেকের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত হয়েছে ধর্মাচরণের স্বাধীনতায়, যেকোনো ধর্ম অনুসরণের অধিকারে। কিন্তু বিবেকের স্বাধীনতায় নিরীশ্বরবাদের স্বাধীনতা নেই। বিবেকের স্বাধীনতাকে ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় পর্যবসিত করায়, আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে অসমাধিকার প্রবর্তনে, নিরীস্বরবাদীদের প্রতি বৈষম্যে আন্তর্জাতিক অধিকারের আদর্শ লঙ্ঘিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

১। বিপ্লবে জন্ম

অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত রাষ্ট্র থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নীতিগতভাবে অন্যবিধ। এ হল ইতিহাসের দিক থেকে নতুন টাইপের রাষ্ট্র।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম নেয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে যখন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক মেহনতি জনগণ শোষকদের উচ্ছেদ করে, পীড়ন ও অসাম্য থেকে মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য ক্ষমতা নেয় নিজেদের হাতে। একদিক থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় হল নিজেদের মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতিদের সংগ্রামের সর্বোচ্চ পরিণতি। অন্যদিকে এটা হল নতুন ঐতিহাসিক যুগ — পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগের শুরু। সমাজতন্ত্র

নির্মাণ করা, নতুন জীবন গঠন করার জন্য সমস্ত মেহনতিদের মিলিত করার উদ্দেশ্যে নতুন ধরনের রাষ্ট্র প্রয়োজনীয়।

ঐতিহাসিক মঞ্চে নবাগত শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করেছে একাধিক বার। তবে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কেবল এক শোষক শ্রেণীর জায়গায় অন্য শোষক শ্রেণীর আগমনে এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে সে শ্রেণীর স্বার্থসাধনে। নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতিরা অনুসরণ করে অন্য লক্ষ্য।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপায়ণের গতিপথে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক পরিচালক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে স্থাপিত হয় মেহনতিদের বাস্তব ক্ষমতা। এরূপ রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল সমাজতন্ত্র নির্মাণ, অর্থাৎ এমন সমাজ নির্মাণ যা উৎপাদনী উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা, আইনের চোখে সমস্ত নাগরিকের সমতা, 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে' — এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নতুন এই সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে চলে না। সেটা তো মেহনতিদের পীড়ন আর দমনেরই যন্ত্র, উৎখাত বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে মেহনতিদের বৈপ্লবিক অর্জনের বিরুদ্ধে সেটাকে ব্যবহার করা সম্ভব। বুর্জোয়া রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় সত্যকার গণতন্ত্র প্রবর্তন, পীড়ন ও পরাধীনতা থেকে ব্যাপক জনগণের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক। সেই কারণে বুর্জোয়ার কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে

নিয়ে শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতিরা পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করে।

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োজন নতুন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাবাদর্শীয় জীবন গঠনের জন্য, শ্রম ও পরিভোগের মধ্যে পরিমাণের হিসেব রাখা এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য। রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করা বলতে অবশ্যই বুর্জোয়া সমাজে গড়ে ওঠা সমস্ত প্রথা-প্রতিষ্ঠানেরই নাকচ বোঝায় না। পুঁজিতন্ত্রে গঠিত ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট, ডাক-ব্যবস্থা, ইত্যাদি ধরনের হিসেব রাখা আর নিবন্ধভুক্তির সংস্থাগুলিকে শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতিদের স্বার্থে কাজে লাগানো সম্ভব, এমনকি প্রয়োজনীয়ই। লেনিন লিখেছেন, 'এ যন্ত্রটাকে ভেঙে দেওয়া চলে না এবং তার দরকার নেই। পুঁজিপতিদের অধীনতা থেকে এটাকে খসিয়ে আনতে হবে, পুঁজিপতি আর তাদের প্রভাবসূত্রগুলিকে তা থেকে **ছিন্ন, কর্তিত, খণ্ডিত** করতে হবে, তাদের করা দরকার প্রলেতারীয় সোভিয়েতের **অধীন**, এগুলিকে করা প্রয়োজন আরো ব্যাপক, বেশি সর্বাত্মক বেশি সর্বজনীন।'*

সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের মূলনীতি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। তার মর্মার্থ হল মেহনতিদের ক্ষমতা, উদ্যোগ আর আত্মসক্রিয়তা, পরিচালকদের নির্বাচন এবং জনগণের কাছে তাদের

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 26, Progress Publishers, Moscow, 1972, p. 106.

জবাবদিহির সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও পরিকল্পনা, কঠোর শৃঙ্খলা ও আইন পালনের পারস্পরিক যোগাযোগ আর মিল। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় ধরে নেওয়া হয়েছে সমাজের কাজ চালাতে অতি সক্রিয় অংশ নেবে জনগণ। লেনিন লিখেছেন, '...অতি মহান ও প্রতিভাশীল দিব্যদৃষ্টির চেয়েও অতুলনীয় রকমের বড়ো কিছু সৃষ্টি করে কোটি কোটি লোকের মেধা।'*

এই নীতির সুসঙ্গত প্রয়োগে কেবল যে জনগণের উদ্যোগ ও সক্রিয়তা বেড়ে ওঠে তাই নয়, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমাজতান্ত্রিক আইন পালন নিশ্চিত হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্র যেসব আইন পাশ করে তা পুরোপুরি মেনে চলা হয়। এইসব আইনে প্রকাশ পায় অধিকাংশ জনগণের অভিপ্রায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজের জরুরি চাহিদা তাতে মেটে। তার পাহারায় থাকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আর পীড়নমুক্ত মেহনতিদের জনমত।

পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে নতুন গড়া একটা জটিল ব্যাপার। লেনিন লিখেছেন, সঠিকভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করার চেয়ে বিপ্লবের যুগে সে ক্ষমতা জয় করা অনেক সহজ।** তাই সর্বত্র এবং তৎক্ষণাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সংহত করা, সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি। এই নীতি অনুসারে ক্ষমতায় আসা মেহনতিদের অগ্রবাহিনীর কর্তব্য দাঁড়ায়

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 26, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 474.

** See: V. I. Lenin, Vol. 33, p. 229.

বৈপ্লবিক সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তোলা, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের নীতিগুলিকে নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারা।

সাফল্যের সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করার প্রথম দৃষ্টান্ত — অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। রাশিয়ার জনগণের বৈপ্লবিক সৃজনশীলতার ফলে জন্ম নেয় রাষ্ট্রক্ষমতার নতুন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান — শ্রমিক, কৃষক আর সৈনিক প্রতিনিধিদের পরিষদ বা সোভিয়েত (বর্তমানে — জন প্রতিনিধি সোভিয়েত)। নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক বনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায় এগুলি। নানা কার্যনির্বাহক সংস্থা, জনগণের মিলিশিয়া, সশস্ত্র বাহিনী তাদের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য থাকে।

মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রথম কর্তব্য দাঁড়িয়েছিল রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্টপন্থী সংস্থাগুলির উচ্ছেদ। কিউবায় প্রাথমিক কাজ ছিল জনগণকে দমন আর বড়ো বড়ো আবাদমালিক আর পুঁজিপতিদের রক্ষা করার সংস্থা সমেত একনায়কী যন্ত্রের উচ্ছেদ এবং এমন রাষ্ট্র গঠন যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করবে।

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন হবে যত বিভিন্নরূপী, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাট গঠনের পথও হবে ততই বিভিন্ন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সামরিক-পুলিসি সংস্থাগুলিকে, আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার সোপান নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধ দমন,

ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বর্ধন, সমাজজীবনে সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা বিকাশে অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক আর সাংস্কৃতিক-শিক্ষাদানমূলক ক্রিয়াকলাপ চালাবার কাজ অবশ্যই নিতে হবে রাষ্ট্রকে।

২। নতুন পথের ধাপ

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। কিন্তু বিপ্লবের পরেই তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্র দেখা দেয় না। পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে থাকে একটা অন্তর্বর্তী পর্ব, তখন লড়াই চলে নতুন আর পুরনো, সদ্যোজাত কিন্তু তখনো অগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে তখনো প্রবল পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে। উৎক্রমণ পর্বে রাষ্ট্রের চরিত্র হয় বিরোধাকীর্ণ। নিজের লক্ষ্য, কর্তব্য, স্বার্থের দিক থেকে তা সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু তা কাজ চালায় এমন পরিস্থিতিতে যেখানে অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের পাশেই থাকে অন্যান্য ধরনের অর্থনীতি। উৎক্রমণ পর্বের অর্থনীতি বহুগাঠনিক। সামাজিক মালিকানার বর্ধমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত মালিকানাও চলতে থাকে। সমাজে তখনো তেমন সব শ্রেণী টিকে থাকে যাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী এবং আপোসহীন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আধিপত্য করে সমস্ত মেহনতি জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী। বুর্জোয়া

ক্ষমতাচ্যুত, কিন্তু প্রতিরোধ দিতে পারে তারা, বৈপ্লবিক শক্তি তা দমন করতে বাধ্য। মেহনতিদের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক . রাষ্ট্র হল একটা প্রবল সাংগঠনিক, জমায়েতকারী শক্তি। দোলায়মানদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করার নীতি অনুসরণ করে। যেখানে ক্ষমতা মেহনতিদের হাতে, সেখানে রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র নির্মাণে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংহত হয়ে ওঠার বিপদ দূরীকরণে কৃতসংকল্প। এ পর্বে শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নির্ধারিত হয় মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুসারে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎক্রমণ পর্বে শ্রেণী সংগ্রামের রূপ ছিল গৃহযুদ্ধ। নবীন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা। তবে শত্রুদের হিসেবে ভুল হয়েছিল: ভেতরের আর বাইরের — উভয় শত্রুকেই পরাস্ত করে জনগণ।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে নতুন রাষ্ট্রকে কেবল সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে তাই নয়, বাইরের বিপদ থেকেও রক্ষা করতে হবে পিতৃভূমিকে। উৎক্রমণ পর্বে রাষ্ট্র কেন বুর্জোয়ার ওপর মেহনতিদের রাজনৈতিক আধিপত্যের হাতিয়ার তার প্রধান কারণ এই ঘটনাচক্রটাই।

উৎক্রমণ পর্বে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়গুলির ওপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল বনিয়াদ। তবে সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে ছোটো ছোটো উদ্যোগ ব্যক্তিগত

মালিকানার অধীনে থেকে যায়। কৃষক আর শহরের কারুজীবীদের মধ্যে বেড়ে ওঠে সমবায় আন্দোলন। বিপ্লব চলতে থাকে আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও: শিক্ষা আসে সকলের আয়ত্তে। লোকেদের জীবনধারা বদলে যায়, তার ভিত্তি দাঁড়ায় মানবতা, যৌথ প্রেরণা, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় সর্বজনীন। সর্বজনীন রাষ্ট্র দাঁড়ায় নতুন সামাজিক ভিত্তির ওপর, সে ভিত্তি হল সমগ্র জনগণ, সমস্ত মেহনতি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সামাজিক ন্যায় আর শান্তির জন্য সক্রিয় সঙ্গতিশীল যোদ্ধা।

৩। রাষ্ট্রের সৃজনমূলক ভূমিকা

সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের চরিত্র বদলে যায়, সমৃদ্ধ হয় তার কাজকর্ম। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্ম শুরু হয় বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কর্তব্য দাঁড়ায় অর্থনীতির পুনর্গঠন, তাকে ব্যাপক মেহনতিজনের স্বার্থ ও প্রয়োজনের অধিনে আনয়ন। এ কর্তব্য সাধনের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপ হয় নানা রকমের। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা সাধিত হয় সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন এবং কৃষির সমবায়ীকরণের গতিপথে। সোভিয়েত ইউনিয়নের

অর্থনীতি বিকাশে প্রতিফলিত হয় এই ঘটনাচক্র যে নবীন রাষ্ট্রটি দীর্ঘকাল ছিল পুঁজিতান্ত্রিক পরিবেষ্টনের মধ্যে। জার্মান ফ্যাসিজম এবং জাপানি সমরবাদের বিরুদ্ধে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪১-১৯৪৫) সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিযুক্ত ছিল আগ্রাসন প্রতিহত করে হিটলারি দঙ্গলকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে তোলার পরই কেবল জাতীয় অর্থনীতির আরো বিকাশে প্রবৃত্ত হয়। বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতির ভারকেন্দ্র সরে এসেছে অর্থনীতির প্রখরীকরণ, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বর্ধন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ, শ্রমের সংগঠন উন্নয়নে।

সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনী পলিসি, পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অর্থনীতির সামরীকরণের পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররা নিজেদের প্রতিরক্ষাসামর্থ্য দৃঢ় করতে বাধ্য হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রে শ্রম ও পরিভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় এই মূলনীতিতে: প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে। শ্রম হয়ে দাঁড়ায় প্রতিটি নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল শ্রম সম্পর্ক নিয়ামন ও ভোগ্য বস্তুর বণ্টন, কর্মে নিয়োগ, শ্রম অধিকার এবং কর্মীদের কর্তব্য নির্ধারণ এবং এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা, বেতন ব্যবস্থা নির্ণয় ও উন্নয়ন, সামাজিক তহবিল থেকে মাতৃ- ও শিশুমঙ্গল, শিশু প্রতিষ্ঠানাদির ব্যয়নির্বাহ, পেনশন, সামাজিক বীমা, সমস্ত স্তরে বিনা বেতনে শিক্ষা,

ছাত্রবৃত্তি, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ইত্যাদির ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের বিকাশ এবং জনগণের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সামাজিক কাজ প্রসারিত হচ্ছে। জীবনযাত্রায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠানাদি ছড়াচ্ছে, বেড়ে উঠছে গৃহস্থালির শিল্পায়ন যাতে মেহনতিদের সামাজিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি, নাগরিকদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সুযোগ মিলছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে পড়ে জনশিক্ষা, বিজ্ঞানের বিকাশ, গণ সংবাদ মাধ্যমের কাজ, শরীর চর্চা ও ক্রীড়ার বিকাশের পরিচালনা। সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা, জনগণের মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার প্রচারে দেশে গড়ে ওঠে নতুন একটা নৈতিক আবহাওয়া। দেখা দিচ্ছে ও সুদৃঢ় হচ্ছে শ্রমজীবীদের আত্মমর্যাদা, দাস্য মনোবৃত্তি কাটিয়ে উঠছে তারা।

আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি মূলাঙ্গ হল নতুন জাতীয় বুদ্ধিজীবী গঠন। যখন সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল ভিত্তি পাতা হয়েছে, গড়ে উঠেছে বুদ্ধিজীবী, তখন বিশেষ তাৎপর্য ধরে বিজ্ঞানের বিকাশ, শিল্পীয় সৃষ্টিকর্ম। সামনে এসে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিশ্বব্যাপী এক সমস্যা — সর্বাঙ্গীণরূপে ও সুসামঞ্জস্যে বিকশিত ব্যক্তির ক্রমিক রূপলাভের পূর্বশর্ত গড়া।

সমাজতান্ত্রিক আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় বোঝায় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি,

নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা, সামাজিক সংগঠনগুলির অধিকার ও বৈধ স্বার্থ রক্ষা। আইন ও শৃঙ্খলার সর্ববিধ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাষ্ট্র, যথাযথরূপে স্থির করে লঙ্ঘনের জন্য ঠিক কে দোষী। আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়াও তা নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচুর লালনমূলক প্রতিষেধক কাজও চালানো হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই ক্রিয়াকলাপ থেমে যাবে যখন বিলুপ্ত হবে অপরাধপ্রবণতা, পরজীবিতার মনোবৃত্তি, সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমে লিপ্ত না থেকে দিন কাটাবার স্পৃহা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারিত হয় সমাজতন্ত্রের মানববাদী মর্মার্থ দিয়ে। দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আসছে সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, তার আগ্রাসনশীলতা থেকে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রথম প্রয়োগ না করার একতরফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সার্বত্রিক ও পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছে। এরূপ প্রতিশ্রুতি দানের পেছনে রয়েছে বিশ্বে এমন পরিস্থিতি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা যাতে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয় পারমাণবিক অস্ত্র। তাতে করে রক্ষা পাবে এ গ্রহের জীবন। শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্য হল কলহমূলক প্রশ্ন মীমাংসার উপায় হিশেবে যুদ্ধ বর্জন, উভয়ত গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের সন্ধান। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে পড়ে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য ক্রিয়াকলাপ, তথা সারা

বিশ্বে শান্তির জন্য সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যেকোনো রূপের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে জনগণ লড়ছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাদের সঙ্গে একাত্ম।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবজেকটিভ ভিত্তি হল অর্থনৈতিক যোগাযোগের বিকাশ, কারবারি সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রসার। সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির রাষ্ট্রগুলি এই কথা থেকে এগোয় যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কেবল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে, ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) ফ্যাসিজম ধ্বংস পাওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রের যে বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় সামাজিক ন্যায় এবং প্রগতি, সমতা ও গণতন্ত্রের একক লক্ষ্যের ভিত্তিতে নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, সামরিক — সর্বক্ষেত্রেই প্রসারিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করে, বাড়িয়ে তোলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা।

৪। নতুন ধরনের গণতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, নতুন ধরনের গণতন্ত্র গড়ে না তুলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপলাভ ও বিকাশ সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে থাকে কোন আদর্শ, বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে কী তার পার্থক্য?

পুঁজিতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা সাধারণত দাবি করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল সবচেয়ে সুসম্পূর্ণ গণতন্ত্র, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে কোনো কিছু উন্নত করার যদি-বা থাকে, তবে সেটা অন্তত গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান নিয়ে নয়।

অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতারা মূলত এই ধরনের অভিমত পোষণ করেন। তাঁদের যা ধ্যানধারণা, সেটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থন ছাড়া আর কিছু নয়। এইধরনের মতে প্রকাশ পায় ইউরোপকেন্দ্রিকতা, এই প্রত্যয় যে রাজনৈতিক সংগঠনের পশ্চিমী মডেলই হল গোটা বিশ্বের আদর্শ।

একেবারে যেন বিপরীত আরেকটা অবস্থানের কথাও জানা আছে: যেমন বুর্জোয়া, তেমনি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকেও নস্যাৎ, সমাজতন্ত্রের পক্ষে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোনোরকম ইতিবাচক ভূমিকা অস্বীকার। এই ধরনের অবস্থান কেবল নিরর্থক নয়, সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকরই। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমাজতন্ত্র যেন গড়া যায় ঐতিহাসিক শূন্যে, তার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত আছে কিনা তার পরোয়া না করেই। সমস্ত গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি এই মনোভাব কার্যক্ষেত্রে কী দাঁড়ায়, কামপুচিয়ায় পল পোতের আমল তার সাক্ষ্য। দুষ্প্রয়াসী মানববিদ্বেষী একটা চক্র পুরনো, পুঁজিতান্ত্রিক সবকিছু নাকচ করার নামে নিশ্চিহ্ন করে নগর, ধ্বংস করে বুদ্ধিজীবীদের, সাংস্কৃতিক সম্পদ। দেশ পরিণত হয় এক বিশাল বন্দিশিবিরে, অনুসৃত

হয় গণনিধনের পলিসি। কাম্পুচিয়ার জন সরকার বর্তমানে মেহনতিদের সামনে সমাজতন্ত্রে ক্রমিক উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিত মেলে ধরছে।

গণতন্ত্রের প্রশ্নে সৃজনশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নীতিগতভাবে যেমন পুঁজিতন্ত্রের ওকালতি তেমনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সুকীতিগুলির প্রতি নস্যাৎবাদী মনোভাব, উভয় থেকেই নীতিগতভাবে পৃথক। সমাজতন্ত্র দেখা দিয়েছে শূন্য থেকে নয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রথা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন জিনিস কম নেই যা ঘোষিত হয়েছিল বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়েই কিন্তু পুঁজিতন্ত্র বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা পাকাপাকি বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত নাগরিকের সমতার নীতি বলবৎ, কিন্তু তা কেবল আইনের সামনে বাহ্যিক সমতায় পর্যবসিত নয়, অনেক ব্যাপক ও গণতান্ত্রিক নীতির মূলাঙ্গ তা, রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক, আত্মিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে লোকেদের সমতা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইতিহাসে প্রথম সংবিধানে ঘোষিত এবং কার্যক্ষেত্রে অনুসৃত হচ্ছে নাগরিকের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার: শ্রম, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষালাভ, ইত্যাদির অধিকার। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত: উৎপাদনের পরিচালনায়, শ্রম সম্পর্কের নিয়ামনে বাস্তব অংশ নেয় শ্রমজীবীরা। সমাধিকারের নীতিতে বোঝায় সমস্ত ক্ষেত্রেই নাগরিকদের সমতা, যে সামাজিক পার্থক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সমাজে লোকেদের অসম অবস্থা, তা দূরীকরণের পথে

সমাজের বিকাশ। এই ধরনের পার্থক্য হল কায়িক ও মানসিক শ্রম, নারী ও পুরুষ, শহর আর গ্রাম, অসম অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কার্যকরতা প্রকাশ পাচ্ছে ঘোষিত অধিকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গ্যারাণ্টিতে, সমাজের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা আর আত্মিক সংস্কৃতির বিকাশে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চরিত্র সৃজনধর্মী, গঠনমূলক। তার উদ্দেশ্য জনগণের সৃজনী শক্তির উদ্ঘাটন এবং তাদেরই স্বার্থে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার। যেমন, শ্রমের অধিকারেই নিহিত রয়েছে মানবিক শক্তি উদ্ঘাটনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কেননা শ্রমই হল প্রত্যেকের সামর্থ্য প্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র। শিক্ষার অধিকারে, সাংস্কৃতিক সুকৃতি ভোগের সুযোগ, সৃজনের স্বাধীনতাতেও রয়েছে একই নীতি। শিক্ষার অধিকার গ্যারাণ্টিকৃত হচ্ছে বিনা বেতনে সর্ববিধ শিক্ষালাভে, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার্থীকে রাষ্ট্রীয় বৃত্তি দানে, ছাত্রদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধায়। বিনা বেতনে সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষালাভের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত সংবিধানে।

বৈজ্ঞানিক, টেকনিকাল, শিল্পীয় সৃজনের স্বাধীনতাও সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকারভুক্ত। সেটা নিশ্চিত হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উদ্ভাবনী ক্রিয়াকলাপ আর সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তনে, সাহিত্য, শিল্পের বিকাশে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি গড়ে দেয় রাষ্ট্র,

স্বেচ্ছাসেবী সমাজ আর সৃজনী সংঘগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়, জাতীয় অর্থনীতি এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নবোদ্ভাবন আর যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থাদির প্রস্তাব কার্যকর করে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ক্রমাগত বিকশিত ও সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রসারের প্রশ্ন ক্রমাগত আলোচিত হয় শাসক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির কংগ্রেসে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ও সম্পূর্ণীকরণে দেখা দেবে ক্রমেই নতুন নতুন জটিলতর সমস্যা। এটাই চলবে কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মপরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবিকাশ অবধি গোটা পর্বটা ধরে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কৃতিত্ব হবে যত সুস্পষ্ট, ততই জরুরি হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরো বিকাশ, নাগরিকের, শ্রম যৌথের অধিকার, স্বাধীনতা, কর্তব্যের আরো সমৃদ্ধির প্রশ্ন। যেমন, বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গণতন্ত্র বিকাশের জরুরি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসনের নীতি সুসঙ্গতরূপে কার্যকৃত করা: রাষ্ট্রক্ষমতার নির্বাচিত সংস্থা, জনপ্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির ক্রিয়াকলাপের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, পরিচালনায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের প্রসার ও ফলপ্রদতা বর্ধন, নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির কার্যকরতা, সামাজিক সংস্থাগুলির সক্রিয়তা, জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনা, সিদ্ধান্ত সংরচন ও গ্রহণ পদ্ধতির গণতন্ত্রীকরণ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশে ধরে

নেওয়া হয় অবিরাম সংগ্রাম তার নীতিগুলির ক্ষেত্রে সর্ববিধ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে: আমলাতান্ত্রিকতা, কর্তৃপক্ষীয়দের পদাধিকারের অপব্যবহার, সমালোচনায় অসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে আপোসহীনতা।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে একটা সুগঠিত সুসম্পূর্ণ ব্যবস্থা বলে ধরলে ভুল হবে। সমাজতন্ত্র একটা সজীব, বিকাশমান ব্যাপার, ক্রমেই তা সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। তার নির্মাণে দুনিয়ার ক্রমেই বেশি জাতি যোগ দিচ্ছে। একত্র সৃষ্টিকর্ম, সংস্কৃতির পারস্পরিক সমৃদ্ধির ফলে রূপ নিচ্ছে, গড়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রাসাদ, খোদ জনগণ দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে নিয়োজিত ক্ষমতা।

৫। সোভিয়েত ক্ষমতায় কী বোঝায়

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাইরের যন্ত্রটা দেখতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যন্ত্রের মতোই: মনে হবে দু'ক্ষেত্রেই তো রয়েছে ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, পরিচালনার সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলার সংস্থা। এই সাদৃশ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে একটা বাস্তব ঘটনা: দু'ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা রাষ্ট্র নিয়ে। কিন্তু দুই ধরনের রাষ্ট্রের মিলটুকু ওই পর্যন্তই: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নীতিগতভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র থেকে পৃথক, কেননা এটা হল জনগণের আত্মশাসনের সংস্থা, তা কাজ করে জনগণের স্বার্থে, চালায় জনগণের প্রতিনিধিরা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক

দিক হল এই যে তার ক্রিয়াকলাপ চলে ব্যাপকভাবে সামাজিক নীতির ওপর। যেমন, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হল জনপ্রতিনিধিদের সোভিয়েত, তাতে মিলেছে যেমতে রাষ্ট্রিক সংস্থা, তেমনি সামাজিক সংগঠনেরও নানা দিক। সোভিয়েতের ডেপুটিরা নির্বাচনের আগে যেখানে কাজ করতেন, সেখানেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পেশাদার আইনপ্রণেতায় পরিণত হন না তাঁরা, রাষ্ট্র চালনায় অংশ নেন জনসেবার ভিত্তিতে। সোভিয়েতগুলির অধিবেশনে সমবেত হন তাঁরা, সোভিয়েতগুলির স্থায়ী কমিশনেও কাজ করেন। কমিশন গঠিত হয় অর্থনীতি, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, যুবপ্রসঙ্গ, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক শৃঙ্খলা পালন, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে। তার কাজে শুধু ডেপুটিরা নয়, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিশেষজ্ঞরাও যোগ দেন।

জনক্ষমতার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র প্রকাশ পায় শাসনের বিশেষ রূপে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনে ক্ষমতার সমস্ত সংস্থাই নির্বাচিত হয় মেহনতিদের দ্বারা এবং তাদের কাছেই তারা জবাবদিহি করে। ক্ষমতার সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাই নিজেদের এলাকায় ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বনিয়াদ। সাবালক সমস্ত অধিবাসীই নির্বাচনে অংশ নেবার অধিকারী, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনোরূপ সংকোচন থাকে না। সমস্ত প্রতিনিধির ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে থাকে নির্বাচকদের নির্দেশনামা। তাতে

নির্বাচকরা তাদের স্বার্থ আর দাবি জানায়, যা বিবেচনা করতে প্রতিনিধিরা বাধ্য।

প্রতিনিধি প্রত্যাহারের অধিকার আছে নির্বাচকদের। কোনো প্রতিনিধি তাঁর ওপর অর্পিত আস্থার উপযোগী হতে না পারলে নির্বাচকদের, শ্রম যৌথ, সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে প্রত্যাহৃত হয়। এতে করে সোভিয়েতের গঠন প্রভাবিত করার অবিরাম সুযোগ থাকে নির্বাচকদের। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্বাচকেরা কাজে লাগায় এ সুযোগ।

নির্বাচন নীতির সুসঙ্গত পালন এবং ক্ষমতার নির্বাচিত সংস্থাগুলির নিকট সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক সংস্থাদির জবাবদিহি প্রথার কল্যাণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহনতিদের সত্যকার জনক্ষমতা। সত্যকার ক্ষমতা ভোগ করে নির্বাচিত সংস্থাগুলি হয়ে দাঁড়ায় কাজের প্রতিষ্ঠান। সেটা নিশ্চিত হয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার ক্রিয়াকলাপে আইনপ্রণয়নী, কার্যনির্বাহী আর নিয়ন্ত্রণের কাজ মিলিত করে। যেমন, জনপ্রতিনিধি সোভিয়েত শুধু আইন পাশ আর সিদ্ধান্ত গ্রহণই করে না, গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করায়, বাস্তবে আইন প্রয়োগের ওপর নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশ নেয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার সমস্ত সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে, যার কথা আগে বলা হয়েছে।

শাসনের সমাজতান্ত্রিক নীতি সর্বত্রই অবিলম্বে এবং পূর্ণাকারে চালু হয় না। যেমন কোনো কোনো

দেশে মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণের দরুন সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রথম দিককার পর্যায়ে নির্বাচনাধীকার সীমিত হতে পারে। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরগুলোয় শোষক শ্রেণী, অমেহনতী লোকেরা ভোট দেওয়া এবং নির্বাচিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। প্রতিনিধিত্বের অনুপাতেও অসমানতা ছিল শ্রমিকদের অনুকূলে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করার পর প্রবর্তিত হয় সর্বজনীন সমান ভোটাধিকার। যেসব দেশ সমাজতন্ত্রের পথ নেয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর, সেখানে দেখা দেয় অন্যরকম পরিস্থিতি। সাধারণত এসব দেশে শ্রেণীগত বিবেচনায় ভোটাধিকার সংকুচিত করা হয় নি।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শাসনের রূপেও বিদ্যমান রাজনৈতিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্য জনিত মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতন্ত্রের বিকাশ রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে অধিবাসীদের ক্রমেই ব্যাপক অংশগ্রহণের সঙ্গে জড়িত। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাথমিক সর্বজনীন আলোচনা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো আইন পাশ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৭৭ সালে খসড়া সংবিধানের আলোচনায় যোগ দেয় ১৪ কোটি লোক, শ্রম যৌথ বিষয়ে খসড়া আইন — ১১ কোটি। কিউবা প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ডিক্রি গৃহীত হয় মেহনতিদের সভাসমিতিতে প্রকাশ্য ভোটে। প্রত্যেক দেশে

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র থেকে দেখা দিয়েছে শাসনের বিভিন্ন এবং চিত্তাকর্ষক নানা রূপ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারে ঐকিক বা ফেডারেটিভ। ঐকিক প্রজাতন্ত্র হয় প্রশাসনিক-ভূভাগীয় ইউনিটগুলি নিয়ে, এবং তাদের সমগ্র ভূখণ্ডে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গড়া হয়। ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র হল জাতীয়তা অনুসারে একাধিক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রকল্পের স্বেচ্ছামিলন। সমস্ত জাতির সার্বভৌমত্ব, তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত হয় তাতে।

সোভিয়েত ফেডারেশনের ভিত্তিতে আছে সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার সার্বভৌমত্ব, সমাধিকার, অবাধ বিকাশ, সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাদের মৈত্রী ও সহযোগিতার গণতান্ত্রিক নীতি। মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলে এ নীতিগুলি থেকে দেখা দিয়েছে একটা জটিল ও বহুরূপী ফেডারেশন ব্যবস্থা। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে ১৫টি অঙ্গ প্রজাতন্ত্র, ২০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, ৮টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ১০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। প্রতিটি সোভিয়েতে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রই সার্বভৌম রাষ্ট্র। নিজেদের ভূখণ্ডে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা চালায়, নিজ নিজ সংবিধান আছে তাদের, তাতে নির্দিষ্ট জাতিটির বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য বিবেচিত হয়, আছে তাদের ক্ষমতা আর প্রশাসনের উচ্চ সংস্থা, প্রজাতান্ত্রিক বিধান-প্রণয়ণী ব্যবস্থা, স্থির করে নিজেদের প্রশাসনিক-ভূভাগীয় গঠন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন চুক্তি স্বাক্ষর, কূটনীতিক ও দূত বিনিময়, আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেবার অধিকার আছে তাদের।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র হল অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের চৌহদ্দির অভ্যন্তরে জাতীয়-রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনের রূপ। এদেরও নিজস্ব সংবিধান থাকে যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। নিজ নিজ ভূখণ্ডে সামূহিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ব্যবস্থা করে তারা। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সম্মতি ছাড়া তাদের ভূখণ্ডসীমা বদলাতে পারে না।

স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আর প্রদেশও হল ছোটো ছোটো জাতির রাষ্ট্রিক স্বায়ত্তশাসনের রূপ। অভ্যন্তরীণ জীবনে প্রশাসনিক স্বায়ত্তাধিকার ভোগ করে তারা, নিজস্ব রাষ্ট্রিক সংস্থাদি আছে তাদের। সমস্ত রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়-ভূভাগীয় অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানাদিতে নিজেদের মাতৃভাষা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উপায় হিশেবে রুশ ভাষা প্রচলিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় সমস্যার সমাধানে ফেডারেশন গঠন একটা ইতিবাচক ভূমিকা নেয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিবাসী জাতি ও জাতিসত্তাগুলির মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক বিকাশে সাহায্য হয় তাতে, গড়ে ওঠে নতুন একটা ঐতিহাসিক মেল — সোভিয়েত জনগণ। সোভিয়েত অভিজ্ঞতার একটা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে: সোভিয়েত ফেডারেশন দেখা দেয় যখন কয়েকটি জাতি

ইতিমধ্যেই রূপ নিয়েছিল। জাতিগুলির বিকাশ, পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্কের জন্য, ক্ষমতার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ওপর আস্থা সুদৃঢ় করার জন্য তাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রদানের গুরুত্ব ছিল নীতিগত।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ নিয়েছে এমন কিছু বহুভাষী রাষ্ট্রে সম্পর্ক গড়ে উঠছে অন্যভাবে। মাঝে মাঝে একটি রাষ্ট্রেই মিলিত হয় বিভিন্ন জাতিসত্তা যাদের মধ্যে কৌলিক সম্পর্কের জের প্রবল, দেখা দেয় কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা। এই পরিস্থিতিতে ফেডারেশন নয়, ঐকিক ধরনের রাষ্ট্রই সম্ভবত বেশি ন্যায্য।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল গণতন্ত্রের অবিরাম ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ। তার ভিত্তি থেকেই যায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকা, পরিচালনায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, নাগরিকদের অধিকার, স্বাধীনতা, কর্তব্যের প্রসার ও সারবত্তা বর্ধন, সমাজতান্ত্রিক বৈধতার কঠোর পালন। বৈধতা বলতে বোঝা হচ্ছে রাষ্ট্র যেসব আইন পাশ করেছে সমস্ত নাগরিক, সংগঠন, রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক তার দ্বিধাহীন অনুসরণ। কঠোরভাবে আইন পালিত হলে ক্ষমতার অপব্যবহার, আত্মমুখিতার সুযোগ থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক বৈধতার প্রধান দাবি হল ক্ষমতার ও প্রশাসনের স্থানীয় সংস্থা তথা বিচারালয় ও তদন্ত বিভাগের সমস্ত নির্দেশের ওপর আইনের সর্বোচ্চতা নিশ্চিত করা। আইন পাশ করে ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা। সমাজতান্ত্রিক বৈধতা হল আইনের সর্বজনীন পালন, নাগরিকদের অধিকার, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা মেনে

চলা ও রক্ষা করা, আইন পালনের ওপর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক সংস্থার কোনো একটা কাজ, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নাগরিকের নালিশ যথাসময়ে সঠিকভাবে বিচার, ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক বৈধতার ভিত্তিতে রয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত নাগরিকের ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও কর্তব্যের নীতি।

রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ চলে মেহনতি জনগণের সক্রিয়তা এবং তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির পেছনে সর্বজনীন সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। সামাজিক-রাজনৈতিক সক্রিয়তা, উদ্যোগ মিলিত হয় লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রম সক্রিয়তার সঙ্গে, প্রকাশ পায় তা উৎপাদন পরিচালনায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে। যেমন শ্রমিক সমাবেশে, উৎপাদনী সম্মেলনে প্রতি বছর বক্তৃতা দেয় ৮ কোটির বেশি সোভিয়েত মানুষ। ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে শ্রমের তেমন ধরনের সংগঠন যাতে বিকশিত হয় আত্মপরিচালনা।

পরিকল্পনের উন্নয়নে, একক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত পরিচালন সংস্থার ক্রিয়াকর্মের বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ততায় বিপুল গুরুত্ব অর্পণ করে শাসক কমিউনিস্ট পার্টিরা।

৬। সাধারণ লক্ষ্য

রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংগঠনাদি, তাদের ক্রিয়াকর্মের মানাদর্শ দিয়ে গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীবৈর

না থাকায় তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ক্ষমতার জন্য আন্তঃপার্টি সংগ্রাম থেকে মুক্ত। সমস্ত সংগঠনই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাধারণ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ, নিজ নিজ কর্তব্য থাকে তাদের।

সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক কোষ হল শ্রম যৌথ। এটা হল কল-কারখানা, নির্মাণক্ষেত্র, কৃষি, ইনস্টিটিউট, হাসপাতাল, স্কুল, ইত্যাদিতে সাধারণ উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপে মিলিত লোকেদের সমিতি।

নিজেদের অভ্যন্তরীণ, সর্বাগ্রে উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপে শ্রম যৌথ সিদ্ধান্ত নেয় আত্মপরিচালনার ভিত্তিতে। যৌথের সমস্ত সদস্য একত্রে গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, তা পালনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, নির্বাচন করে পরিচালকদের, যারা কাজ চালায় শ্রম যৌথের পরামর্শের ওপর নির্ভর করে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে, উৎপাদন ও সামাজিক বিকাশের পরিকল্পনে, কর্মচালকদের প্রস্তুতি ও নিয়োগে, উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানাদির পরিচালনায় অংশ নেয় শ্রম যৌথ, কর্তৃপক্ষ যাতে শ্রম ও জীবনযাত্রার পরিস্থিতি উন্নত করে, তার জন্য যত্ন নেয়, উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদি এবং বৈষয়িক উৎসাহ দানের জন্য বরাদ্দ টাকা কিভাবে খরচ হচ্ছে, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।

জনগণের সৃজনী সক্রিয়তা যত বাড়ে, লক্ষ লক্ষ মেহনতি এসে পড়ে রাষ্ট্রিক ব্যাপারাদির চালনায়,

ততই বেড়ে ওঠে সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায় সেই সংগঠন, নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হেতু যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং প্রভাবশালী। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এইরূপ কোষকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি, যা সামাজিক বিকাশের একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ত।

কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করে সমস্ত মেহনতির মৌলিক স্বার্থ যে একই, তার প্রগাঢ় চেতনা। একমতাবলম্বী কমিউনিস্টরা নির্ধারক প্রভাব ফেলে সামাজিক বিকাশের গতিতে, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আদর্শগুলিকে পরিণত করে বাস্তবে। জনগণের রাজনৈতিক অগ্রবাহিনী রূপে শাসক কমিউনিস্ট পার্টির যে প্রতিষ্ঠা সেটা দেশে একপার্টি না বহুপার্টি ব্যবস্থা চালু আছে তার ওপর নির্ভর করে না। গণতান্ত্রিক জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখা গেল, সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বার্থপ্রবক্তা পার্টির অস্তিত্বে সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে কমিউনিস্ট পার্টির অসুবিধা হচ্ছে না। শাসক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকার নীতি সংবিধানে বিধিবদ্ধ।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকা বৃদ্ধি পায় ও প্রবল হয়। জনগণের রাজনৈতিক অগ্রবাহিনী হিশেবে পার্টির অবস্থান হেতু আসে নিজের সংগঠনশীলতা ও কর্মিষ্ঠতা বাড়াবার জন্য বিশেষ উচ্চ মাত্রার দাবি। সোভিয়েত ইউনিয়নের

কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদে চালিত, সৃজনধর্মিতার সঙ্গে তাকে বিকশিত করে, নিশ্চিত করে বৈপ্লবিক তত্ত্বের সঙ্গে বৈপ্লবিক প্রয়োগের আঙ্গিক ঐক্য। নিজের কাজকর্ম তা চালায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে, নিজের পঙক্তির ভাবাদর্শীয় ও সাংগঠনিক ঐক্য ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে, সংহত করে সচেতন শৃঙ্খলা, পার্টি সদস্যদের সক্রিয়তা বর্ধিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সমালোচনার দৃষ্টিতে বিচার করে নিজেদের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অবিরাম অনুধাবন, মূল্যায়ন, সদ্ব্যবহার করে যায়, সুসঙ্গতরূপে অনুসরণ করে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি।

বাস্তব সমাজতন্ত্রের কাজকর্মে রাষ্ট্র চালনায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের নানা রূপ দেখা গিয়েছে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কার্যত সমস্ত নাগরিকই যোগ দেয় প্রতিনিধি নির্বাচনে। লক্ষ লক্ষ লোক ডেপুটিদের অবিরাম সাহায্য করে তাদের কর্মনির্বাহে, সক্রিয় অংশ নেয় জনগণের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এবং অন্যান্য সংগঠনে যা শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে মিলিশিয়া ব্যবস্থাকে। সামাজিক সংগঠনগুলিও রাষ্ট্র চালনায় শরিক। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশেই গড়ে উঠেছে সামাজিক সংগঠনের নিজ নিজ ব্যবস্থা। তবে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতিগত বহু সাধারণ দিক আছে তাদের মধ্যে। যেমন, সমস্ত দেশেই রয়েছে গণচরিত্রের ট্রেড ইউনিয়ন, সৃজনী কর্মীদের স্বেচ্ছাধীন সংঘ: বিজ্ঞানী

সমিতি, সাহিত্যিক, সুরকার, স্থপতিদের সংঘ, জ্ঞানপ্রচারণী সমাজ, ইত্যাদি। সামাজিক সংগঠনের শক্তি এইখানে যে তা লোকেদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের পেশা, স্বার্থ, প্রবৃত্তি অনুসারে। যুবজনের কমিউনিস্ট লীগে ঐক্যবদ্ধ হয় উঠতি পুরুষদের সবচেয়ে সচেতন ও সক্রিয় অংশটা, কমিউনিস্ট পার্টির সহায়ক এবং মজুদ বাহিনী তারাই।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম চালাতে হয় না ট্রেড ইউনিয়নকে, কেননা বুর্জোয়া সেখানে নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে একেবারে অন্যবিধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ট্রেড ইউনিয়নের, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অল্পাংশের নয়, অধিকাংশের স্বার্থপ্রবক্তা। এই পরিস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়ন হয়ে দাঁড়ায় পরিচালনার, উদ্যোগাদির ব্যবস্থাপনা শিক্ষার গণবিদ্যালয়, শ্রমজীবীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তারা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয় ট্রেড ইউনিয়ন। উৎপাদন পরিচালনায় অংশ নেওয়ায় কর্মীদের যে কেবল সক্রিয়তা, সংস্কৃতি, সচেতনতাই বাড়ে তাই নয়, শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব, অর্থনীতি পরিচালনার পক্ষে সবচেয়ে সক্ষমদের বাছাও সম্ভব হয়।

জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পন, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে সক্রিয় অংশ নেয় ট্রেড ইউনিয়ন। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনী পরিকল্পনা সংরচিত হতে শুরু করে শ্রম যৌথগুলি থেকে।

পরিকল্পনা আইন রূপে গ্রাহ্য হয় কেবল তার খসড়া উদ্যোগের যৌথে আলোচিত এবং সংশোধন প্রস্তাবাদি গৃহীত হবার পর। ট্রেড ইউনিয়ন কেবল পরিচালনায় যোগ দেয় তাই নয়, শ্রমিকদের স্বার্থই রক্ষা করে। উদ্যোক্তাদের স্বেচ্ছাচার থেকে, শোষণ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার প্রয়োজন নেই সমাজতন্ত্রে। শ্রমিক, যৌথখামারি, কর্মচারীদের বৈধ স্বার্থরক্ষায় ট্রেড ইউনিয়ন লড়ে দপ্তরসর্বস্বতা, গতানুগতিকতা, বাহ্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। তেমন সবকিছুর বিরুদ্ধে যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রম সম্পর্কের চরিত্রের পক্ষে বিজাতীয়।

শ্রম যৌথ কাজ করে উদ্যোগের কর্তৃপক্ষ আর ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে। এ চুক্তিতে থাকে কাজের বনিয়াদি শর্তাদি। এ শর্ত পালিত না হলে ট্রেড ইউনিয়ন চুক্তি নাকচ করে তার শর্ত পালন না করার জন্য যে পরিচালকেরা দায়ী, উচ্চতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অপসারণ দাবি করার অধিকার রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত: ট্রেড ইউনিয়নের, তার কমিটির প্রাথমিক সম্মতি ছাড়া কেবল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় উদ্যোগের কোনো কর্মীকে বরখাস্ত করা চলবে না। কর্তৃপক্ষ যদি এ নিয়ম লংঘন করে, তাহলে বরখাস্ত করার কারণ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আদালত তার পুনর্নিয়োগের রায় দেয়: ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির প্রাথমিক সম্মতি ছাড়াই যে বরখাস্ত করা হয়েছিল, এই ঘটনাটুকুই যথেষ্ট।

৭। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য হল শ্রমের অধিকার এবং প্রত্যেকের পক্ষ থেকেই শ্রমে লিপ্ত থাকার কর্তব্য, বিশ্রাম, বাসগৃহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষার অধিকার এবং সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা ও বর্ধিত করার কর্তব্য। প্রধান রাজনৈতিক অধিকার হল নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হবার অধিকার, বিভিন্ন সংগঠনে মিলিত হবার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, উৎপাদন ও রাষ্ট্র চালনার অধিকার। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্তব্যও ধার্য করে। সংবিধান অনুসারে সোভিয়েত নাগরিকদের কর্তব্য হল রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা, তার শক্তি বৃদ্ধি, অন্যান্য নাগরিকদের জাতীয় মর্যাদা মান্য, জাতি ও জাতিসত্তাগুলির মৈত্রী সুদৃঢ় করা; সমাজবিরোধী আচরণের প্রতি আপোসহীন হওয়া, অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা বিকাশে, সার্বত্রিক শান্তির সমর্থনে সহায়তা করা।

ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও অধিকার ও স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি দেয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেমন: ব্যক্তির, বাসগৃহের অলঙ্ঘনীয়তা, বিবেকের স্বাধীনতা, নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার। একই সঙ্গে অন্য লোকের অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থ মান্য করতে, শিশুর লালনপালনে যত্ন নিতে, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রমের জন্য তাদের

তৈরি করতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য সদস্য করে তুলতে তারা বাধ্য। অন্যদিকে সন্তানেরাও আবার মাতাপিতাদের সাহায্য করতে বাধ্য। এমন কতকগুলি গণতান্ত্রিক নীতিও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌল অধিকার ও কর্তব্য বলে গণ্য যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অজ্ঞাত: সমাজতান্ত্রিক মানবতা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মিল, অধিকারের সর্বজনীনতা, নাগরিকদের সমাধিকার, অধিকার ও কর্তব্যের ঐক্য।

সমাজতান্ত্রিক মানবতায় বোঝায় যে রাষ্ট্রের কাজকর্ম চলে মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে। সমাজতান্ত্রিক মানবতার বাস্তবতা প্রকাশ পায় সমাজতন্ত্রে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের সম্পর্ক উচ্ছেদে, 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে' — এই নীতি কার্যকরী করায়, রাষ্ট্র কর্তৃক মাতৃও শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থায়, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকারে, বৃদ্ধ ও রুগ্ণদের জন্য যত্নে, শিক্ষার অধিকারে। নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, মেহনতিদের অবিরাম সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে গ্যারাণ্টিকৃত। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থায়, নাগরিকদের আরোগ্যলাভ ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা টেকনিক ও স্বাস্থ্যবর্ধন ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়নে, ব্যাপক প্রতিষেধক পদ্ধতির প্রবর্তনে, পরিবেশ রক্ষায়, উঠতি পুরুষদের জন্য প্রযত্নে। শিক্ষালাভ ও শ্রম

লালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন শিশুশ্রম সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষিদ্ধ, রোগ নিবারণ ও হ্রাস, নাগরিকদের দীর্ঘকালীন সক্রিয় জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মিলে বোঝায় যে নাগরিকের সমস্ত অধিকারের কাজ হল প্রতিটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ এবং সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংহতি ও বিকাশে সহায়তা। অন্যদিকে সামাজিক কর্তব্য পালনে সাহায্য হয় ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারাদির পরিচালনায়, সর্বরাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় তাৎপর্যে সিদ্ধান্ত ও আইন আলোচনা ও গ্রহণে নাগরিকদের অধিকার হল ব্যক্তিত্বের আত্মাভিব্যক্তি, তার নাগরিক গুণাবলি বিকাশের একটা উপায়। সেইসঙ্গে প্রত্যেকেই এই অধিকার কাজে লাগালে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমুন্নয়ন এগিয়ে যায়। আরেকটা দৃষ্টান্ত। নিজের নির্বাচিত ক্ষেত্রে সততার সঙ্গে কাজ করার যে দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেকেরই তা পালনে, শ্রম শৃঙ্খলা মেনে চলায় সমাজের স্বার্থ পুষ্ট হয়। কিন্তু সেইসঙ্গেই এরূপ কর্তব্য পালনে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, তার ভেতর শ্রমের চাহিদা গড়ে তোলা, শ্রমকে জীবনে প্রাথমিক প্রয়োজনে পরিণত করায় সাহায্য হয়।

অধিকার সর্বসাধারণের আয়ত্তে এনে দেবার গ্যারাণ্টি রয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদে; কী তার অর্থ? দৃষ্টান্ত হিশেবে

মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, শ্রমের অধিকারটা নেওয়া যাক। কার্যক্ষেত্রে এর অর্থ বেকারি না থাকা, প্রতিটি নাগরিকের কাজ এবং তার পরিমাণ ও গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক পাবার অধিকার। এটা হল শোষণ থেকে মুক্তি, প্রত্যেক নাগরিকের নিজের সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অনুসারে পেশা বেছে নেওয়া, দক্ষতা অর্জন ও বর্ধনের সুযোগ। শ্রমের অধিকার গ্যারাণ্টিকৃত হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে, সোভিয়েত সমাজের উৎপাদনী শক্তির অবিচল বৃদ্ধিতে, অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারি আশংকা বিদূরণে।

রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় উপায়েও শ্রমের অধিকার গ্যারাণ্টিকৃত। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাথমিক সম্মতি ছাড়া উদ্যোগের কোনো কর্মীকে বরখাস্ত করা চলে না। ট্রেড ইউনিয়নের বিনা সম্মতিতে বরখাস্তকে পুনর্বহাল করা হবে। মেহনতিদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণের তাৎপর্য নীতিগত।

বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক রক্ষণেও শ্রমের অধিকার সুনিশ্চিত। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশাসকের ব্যক্তিগত মর্জিতে মেহনতির অবৈধ কর্মচ্যুতি, পুনর্বহালের জন্য আদালতের রায় অপালন, রাষ্ট্রিক বা সামাজিক উদ্যোগের পদাধিকারী কর্তৃক শ্রম আইনের অন্যান্য লঙ্ঘন ঘটলে তার শাস্তি এক বছর অবধি সংশোধনী শ্রম কিংবা পদ থেকে অপসারণ।

অবৈধ বরখাস্তের যেকোনো সিদ্ধান্ত, কর্মে নিয়োগে

যেকোনো বেআইনি অস্বীকৃতির প্রতিবাদ করতে অভিশংসক দপ্তরগুলি বাধ্য। শ্রমিক ও কর্মচারী যে ধরনের কার্যকলাপের জন্য নিযুক্ত তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোনো কাজে তাদের লাগানো আইনে নিষিদ্ধ। কর্মিসংখ্যা হ্রাস অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালে ছাঁটাই শ্রমিক ও কর্মচারীকে বদলি করতে হবে একই উদ্যোগে কিংবা একই অঞ্চলের অন্য কোনো উদ্যোগে স্থায়ী বা সাময়িক কাজে।

শ্রমের অধিকার ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে পেশা বাছাইয়ের স্বাধীনতায়। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিটি নাগরিক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পেশা নির্বাচনে স্বাধীন। এরূপ সুযোগের গুরুত্ব বেড়ে উঠছে মেহনতিদের সাংস্কৃতিক, তাদের চাহিদা, তথা বেশি সারসমৃদ্ধ শ্রমের জন্য চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। পেশা বাছাইয়ের স্বাধীনতা প্রসার বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির সঙ্গে, শ্রমকর্মের পেশাগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

অন্য একটা ব্যাপারেও প্রকাশ পাচ্ছে নির্বাচনের স্বাধীনতা। প্রতিটি লোক তার শ্রম নিয়োগ করতে পারে রাষ্ট্রিক বা সমবায়িক উদ্যোগে অথবা লিপ্ত থাকতে পারে ব্যক্তিগত শ্রমকর্মে, যা প্রধানত অধিবাসীদের সেবা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। অতি বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত শ্রমকর্মে উৎসাহ দিচ্ছে রাষ্ট্র, কিন্তু যা শ্রমপ্রসূত নয় তেমন উপার্জনের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য সামাজিক স্বার্থের ক্ষতি করে মজুরিতে খাটানো শ্রম নিয়োগ মারফত ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ।

শ্রমের অধিকারের একটা অঙ্গ হল শ্রম রক্ষা আর তার শর্ত উন্নয়নের অধিকার। সর্বোপায়ে শ্রমের পরিস্থিতিকে লঘুভার করা রাষ্ট্রের সামাজিক কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সমাজতান্ত্রিক সমাধিকার হল সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে লোকেদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিস্থিতি গঠন। ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে না তার শ্রেণীগত অবস্থা বা জন্মসূত্র, ব্যবহৃত ভাষা, সম্পত্তির পরিমাণ, ধর্মমত, বয়সের ওপর। সমাজতান্ত্রিক সমাধিকার হল অন্য সমস্ত নাগরিকের সঙ্গে যুবজনের, পুরুষের সঙ্গে নারীর, বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের সমান অধিকার। জাতীয় সমানাধিকারে বোঝায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠনে, তথা আদালতে মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার, নিজস্ব স্কুল, মাতৃভাষায় শিশুদের শিক্ষাদান, জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশ, মাতৃভাষায় সংবাদপত্রাদি প্রকাশ, থিয়েটার, অন্যান্য সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক সংগঠনাদি গঠন, জাতি নির্বিশেষে ক্ষমতার সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচিত সমেত যেকোনো পদে নিযুক্ত হবার, সামাজিক, ক্রীড়ামূলক, বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘের সদস্য হবার, পরিচালক সংস্থায় নির্বাচিত হবার, প্রশাসনিক পদ গ্রহণের অধিকার; দেশের ভূখণ্ডে অবাধে চলাচল, ব্যক্তিগত অলঙ্ঘনীয়তা ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রক্ষণের অধিকার।

শ্রমের প্রকৃতি, শিক্ষা ও বৈষয়িক সচ্ছলতার মানে লোকেদের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য ক্রমশ মুছে ফেলার

রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসৃত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাধিকারে। স্বল্পদক্ষ গুরুভার কায়িক শ্রমে নিযুক্ত লোকেদের সংখ্যা হ্রাস, সন্তানবহুল পরিবারের জন্য গর্ভবতী রমণী ও প্রসূতিদের জন্য নানা সুযোগসুবিধাও এই লক্ষ্যে চালিত।

সমাধিকার প্রতিষ্ঠায় বড়ো একটা ভূমিকা নেয় শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার। শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ ভোগের, পেশা বদল আর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ বাড়ে। শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত হয় কারণ তা অবৈতনিক, সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, বৃত্তিমূলক-টেকনিকাল, বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, সান্ধ্য ও পত্রযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা বহুপ্রসারিত। শিক্ষালাভের এইসব গ্যারাণ্টিতে গড়ে ওঠে সমাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিস্থিতিই এমন যে কার্যত প্রতিটি ব্যক্তিরই ঈপ্সিত শিক্ষালাভের সুযোগ আছে, কেবল আকাঙ্ক্ষা আর প্রয়োজনীয় ধৈর্য থাকলেই হল।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি হল অধিকার ও কর্তব্যের ঐক্য, অধিকার ভোগ নাগরিকের কর্তব্য পালন থেকে অবিচ্ছেদ্য। অধিকার ও কর্তব্যের যে ব্যবস্থা সংবিধানে বিধিবদ্ধ তা সবই এই নীতিতে চালিত। যেমন, প্রত্যেকের শ্রমের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও থাকে যে সমাজের কল্যাণে প্রত্যেকে কাজ করতে বাধ্য। তার অর্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক অর্জন, সমস্ত অধিকার মেহনতি

মানুষের সেবায় নিয়োজিত। পরজীবিতার প্রশ্রয় দেয় না রাষ্ট্র, সংগ্রাম করে বিনা শ্রমে উপার্জনের বিরুদ্ধে।

বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যরক্ষা, বার্ধক্যে বৈষয়িক নিরাপত্তা, বাসস্থান, শিক্ষালাভ, সাংস্কৃতিক কল্যাণ ভোগের অধিকার, সৃজন, পরিচালনায় অংশগ্রহণ, সমালোচনার অধিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে থাকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা, অপহরণ ও অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা, তার পরাক্রম বৃদ্ধিতে সাহায্য, অন্য লোকের অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশের অভ্যন্তরস্থ জাতিদের সঙ্গে মৈত্রী এবং বিশ্বের সমস্ত জাতির সঙ্গে সহযোগিতার কর্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্র

১। পশ্চাৎপদতা দূর করার কর্তব্য

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর সামাজিক-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের কর্তব্যে নিয়োজিত। নবীন রাষ্ট্রগুলির সামনে সাধারণ জাতীয় কাজ একটাই: অর্থনীতি, সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ, নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ, নিজেদের কর্মচালক গঠন। অনেকগুলি দেশে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, প্রাধান্য করছে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের প্রবণতা। কতকগুলি দেশে বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণের প্রয়াস লক্ষণীয়। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ জাতীয় সম্পদের সুযোজনা, যেসব সামাজিক শক্তি

স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের কর্তব্য সাধনে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত তাদের সংহত করার লক্ষ্যে চালিত।

নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে শ্রেণী কাঠামো যথেষ্ট বিকশিত নয়, শ্রেণী শক্তির সুনির্দিষ্ট বিন্যাস এখনো ঘটে নি। এইটাই হল রাজনৈতিক অস্থায়িত্ব, সামরিক কু'দেতাগুলির কারণ। অনেককিছুই নির্ভর করে ঘটনার সমাপতন, সৈন্যবাহিনীতে, রাষ্ট্রযন্ত্রে বিভিন্ন গ্রুপের শক্তি অনুপাতের ওপর।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে মেহনতি জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক সক্রিয়তা বিশেষ প্রবল নয়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নিম্ন মান, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দুর্বলতা বা অভাবের ফলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও সক্রিয়তার বিকাশ কঠিন হয়ে পড়ে। এই মুশকিলগুলো নিজের ধরনে প্রতিফলিত শাসক শীর্ষ মহলের ক্রিয়াকলাপে: ব্যাপক মেহনতিজনের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপে দেখা দেয় অনাস্থা। এই মতটা বদ্ধমূল হয় আরো এইজন্য যে পুরনো, কৌলিক-উপজাতীয় সম্পর্কের ঐতিহ্য নিজের ধরনে জড়িয়ে যায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের পরে প্রচলিত নতুন সব ধ্যানধারণার সঙ্গে।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদের ওপর, শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ আর আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার ওপর নির্ভরতা। নয়া-ঔপনিবেশিক পলিসি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বোপায়ে এই পরনির্ভরতা বাড়িয়ে তুলতে সচেষ্ট। অতীত ঔপনিবেশিকতা নয়া-ঔপনিবেশিক পলিসির

পার্থক্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দাসত্বে বাঁধার নতুন পদ্ধতি। নিজেদের পলিসির ভাবাদর্শীয় সমর্থনের ওপর খুবই জোর দেয় সাম্রাজ্যবাদীরা, কিন্তু সর্বাগ্রে কাজে লাগায় অর্থনৈতিক চাপের হাতল। নয়া-ঔপনিবেশিক পলিসির মূলকথা হল বৈদেশিক পুঁজির নিকট উন্নয়নশীল দেশের পরাধীনতা সর্বোপায়ে বজায় রাখা এবং সেই ভিত্তিতে রাজনৈতিক পরাধীনতা কায়েম করা। ঔপনিবেশিক আমলের মতোই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা নবীন রাষ্ট্রগুলিকে তাদের দেশের কাঁচামাল সরবরাহকের ভূমিকায় ফেলে রাখতে চায়। নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরা উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সামরিক-টেকনিকাল সহযোগিতা, ইত্যাদির চুক্তি করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্যদানের বড়াই করা হয় সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে কিন্তু এই সাহায্যের পেছনে যে রয়েছে একচেটিয়ার স্বার্থপর মুনাফাখোরি, সেটা চেপে যাওয়া হয়। লগ্নি করা হয় কেবল সেইসব দেশে যারা খোলাখুলি পুঁজিতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে, বিশেষ করে যে দেশগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তদুপরি ক্রেডিট দেওয়া হয় এই হিসেব করে যে অধমর্ণ টাকাটা খরচ করে নতুন ঋণ চাইতে বাধ্য হবে। লগ্নি থেকে মুনাফার প্রধান ভাগটা পায় একচেটিয়া। উন্নয়নশীল দেশে যেসব ফার্ম গড়ে ওঠে তাদের শেয়ারগুলোর মূল ভাগটা তাদেরই দখলে।

নয়া-ঔপনিবেশিকতায় খোলাখুলি আগ্রাসন, সামরিক দখলও বাদ যায় না। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা

বর্ধনের পলিসি, কোনো কোনো দেশকে তথাকথিত 'যুধ্যমান রাষ্ট্রের' অবস্থায় রেখে দেওয়াটাও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থানুসারী। এই অবস্থায় পড়েছে আফ্রিকার দক্ষিণস্থ রাষ্ট্রগুলি, দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের ভাড়াটে হানাদারদের হামলা ঠেকাতে হচ্ছে তাদের। মধ্য প্রাচ্যে উত্তেজনা বর্ধনের নীতিও নয়া-ঔপনিবেশিকতার অঙ্গ।

সারা বিশ্বে উত্তেজনা বৃদ্ধিতেও নয়া-ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ পলিসিতে কেবল যে বিশ্ব যুদ্ধের বিপদ বেড়ে উঠছে তাই নয়। এতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা দেয় অনাস্থা, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যাহত হয়, নতুন ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন আটকে থাকে। ঠিক এই কারণেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মনে করে যে শান্তিতে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমনে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরনির্ভরতা থেকে উন্নয়নশীল জনগণের পূর্ণ মুক্তির অনুকূল পরিস্থিতি।

অধিকাংশ নবীন রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নেয়। সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পেয়েছে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির দাবিতে। জোটবহির্ভূত আন্দোলন, আফ্রিকীয় ঐক্য সংগঠনের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপেও এটা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা ব্যাপারও বৈশিষ্ট্যসূচক: আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সক্রিয়তা, উদ্দেশ্যমুখিতা, কার্যকরতা বেড়ে উঠছে। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলি

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতা বিলুপ্তি, নিজেদের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চিতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানে অংশগ্রহণের ব্যাপক সমাধিকার, পুঁজি ও দক্ষ কর্মী নিঃসরণ বন্ধের দাবিতে। এইসব দাবি পূর্ণ হলে সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ন্যায্য বিকাশের অনুকূল পরিপ্রেক্ষিত খুলে যাবে।

জোটবহির্ভূতি আন্দোলন চালিত সারা বিশ্বে শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম, জাতীয় স্বাধীনতা, প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যের স্বার্থে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আরেকটি ঘটনা হল আফ্রিকান ঐক্য সংগঠন। বিভিন্ন সামাজিক প্রবণতার রাষ্ট্র তার অন্তর্ভুক্ত। এ সংগঠন নানা মুশকিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে কম নয়, তবে ঔপনিবেশিক পলিসির প্রতিরোধ, বর্ণবাদ, জাতিগত বেড়া তোলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারছে।

আমেরিকান রাষ্ট্র সংগঠনেও প্রকাশ পাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রবণতা। একসারি দেশের প্রভাবে এ সংগঠনে গৃহীত হয়েছে 'ভাবাদর্শীয় বহুত্বের' নীতি। 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' হুজুগের সময় আন্তরামেরিকান ব্যবস্থার নীতিগুলির সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ খাপ না বলে ওয়াশিংটন যে মতবাদ চালু করেছিল, এটা তার বিরোধী। লাতিন আমেরিকান দেশগুলির যৌথ

কূটনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হল ১৯৭৫ সালে কিউবার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য একসারি 'নিষেধাজ্ঞার' কার্যত প্রত্যাহার। একই সময়ে আমেরিকান রাষ্ট্র সংগঠনের বাইরে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, কিউবাকে নিয়ে লাতিন আমেরিকান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার অন্তর্গত। এ ধরনের সদর্থক পরিবর্তনে এই সাক্ষ্য মিলছে যে লাতিন আমেরিকায় শক্তির নতুন বিন্যাস দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এ মহাদেশের বেশ কিছু দেশ ক্রমশ বেরিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে, বিশ্ব মঞ্চে নিজেদের স্বাধীন নীতি অনুসরণে তারা সচেষ্ট।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নিজেদের চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যের ব্যাপারে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরা। অনুন্নত অবস্থা থেকে বহির্গমন, অর্থনৈতিক বিকাশের মানে, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও টেকনিকের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবধান ক্রমশ হ্রাসে প্রকাশ পাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব। এসব দেশের যুগ যুগের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী প্রাক্তন প্রভু দেশগুলি। তাই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশেরা যে দাবি করে যে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন জনিত ক্ষতির পূরণ স্বরূপ পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি কতৃক সম্পদ প্রত্যর্পণ অনেক বাড়াতে হবে, উন্নয়নশীল দেশগুলির

ঋণের বোঝা কমাতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে ক্রেডিটের আন্তর্জাতিক উৎসগুলি থেকে সুবিধাজনক শর্ত, তা ন্যায্য বলে স্বীকার করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররা। উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারা সমর্থন করে তারা, স্বাধীন দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরে থেকে যেকোনো হস্তক্ষেপে বাধা দেয়, বাড়িয়ে তোলে তাদের সঙ্গে সমাধিকারে পারস্পরিক সুবিধার সহযোগিতা।

২। কোন পথ নেওয়া ভালো?

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করল যে জনগণ, তাদের সামনে একান্ত সুনির্দিষ্টতায় এই প্রশ্ন উঠেছে: অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা এবং তজ্জনিত সাম্রাজ্যবাদের নিকট অধীনতা তারা কি অদূর ভবিষ্যতে কাটিয়ে উঠতে পারবে, নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপিত হবে কি? সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া এইসব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশকে করতে চায় নিজেদের স্বার্থাধীন। এই উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা নানান সব তত্ত্ব হাজির করছে সাম্রাজ্যবাদী পলিসির ঔচিত্য প্রমাণের জন্য। ৫০-৬০-এর দশকে নতুন রাষ্ট্রগুলিকে পুঁজিতান্ত্রিক পশ্চিমের পথ ধরাবার চেষ্টা করে তারা। পদ্ধতিটা ছিল খোলাখুলি ইওরোপকেন্দ্রিক, নতুন রাষ্ট্রগুলির জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বাস্তব সমাজতন্ত্রের যে সাফল্য তার আকর্ষণী শক্তি, কিছুরই হিসেব করা হয় নি তাতে।

এশিয়া ও আফ্রিকার নবীন রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশ নেতাই পশ্চিমীকরণের মধ্যে প্রাক্তন উপনিবেশমালিকদের স্বার্থ ধরতে পেরেছিলেন। ৭০-এর দশকে দেখা দিল আধুনিকীকরণের তত্ত্ব। তাতে উন্নয়নশীল দেশের ওপর খোলাখুলি পশ্চিমী মডেল চাপিয়ে দেবার চেষ্টা আর হয় নি। আধুনিকীকরণ বলতে বোঝা হল গোটা অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন, কী একটা যেন সংগঠনহীনতা, বিশৃঙ্খলা থেকে সংগঠন ও শৃখলায়, চিরাচরিত থেকে আধুনিক শিল্পজীবী সমাজে উত্তরণ। কার্যত এই ব্যাপক সূত্রায়ণের তলে লুকিয়ে ছিল এ দাবি যে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি যতকটা পর্যায় পেরিয়ে এসেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলিরও ততকটা পর্যায় অতিক্রম অপরিহার্য।

এই ধারণার পক্ষপাতীরা একদিকে জোর দেয় স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের আবশ্যিকতায়, শৃঙ্খলা স্থাপনে। অন্য দিকে শাসনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক উচ্চকোটি গড়ে তোলায়। তারা এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বকীয়তার সমস্যাটাও মেনে নিতে রাজি, কিন্তু প্রশ্নটার সামাজিক-রাজনৈতিক মর্মার্থটা এড়িয়ে যায়। আসলে সাধারণভাবে, বিশুদ্ধ-চেহারার কোনো রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ হয় না: তা ঘটতে পারে হয় পুঁজিতন্ত্রমুখিতার কাঠামোর মধ্যে, নয় সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে। ওরা দৃষ্টান্তস্বরূপ, নবীন রাষ্ট্রগুলির বিকাশকে পর্যবসিত করে স্রেফ বুর্জোয়া ধরনের রাজনৈতিক

সংগঠনাদির চর্চায় (যেমন, পার্টির সংখ্যাবৃদ্ধি, পার্লামেণ্ট প্রথার বিকাশ), অর্থাৎ এই কথাটা চালিয়ে দেওয়া হয় যে পশ্চিমের নিদর্শনে বিকাশ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। 'আধুনিক করে তোলা' প্রতিষ্ঠানাদির এই উদয়ে কিন্তু মান্ধাতার আমলের ঐতিহ্য অনুসরণ, উপজাতীয় সর্দারদের ক্ষমতা, উপজাতীয়তাবাদ, জাতিভেদ নাকচ হয় না। বোঝাই যায় যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা দ্রুত কাটিয়ে ওঠার পক্ষে এ পথ অনুপযোগী। প্রশনটা কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন প্রবর্তন নিয়ে নয়, নবীন রাষ্ট্র যাতে জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বড়ো বড়ো ও জটিল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়, সেই হল সমস্যা।

উন্নয়নশীল দেশে আরো একটা বিকল্প বা তৃতীয় পথের তত্ত্বও প্রচলিত। তার মূলকথা হল 'পশ্চিমী' আর 'পূর্বীয়' দুই মডেলই পরিত্যাগ। যেমন, একসারি আফ্রিকান দেশে অর্থনৈতিক, আত্মিক জীবনের 'আফ্রিকীয়করণের' প্রচার চলে। এই দিক থেকে তৃতীয় পথের তত্ত্ব — জাতিবাদী।

একদিক থেকে বিকল্প পথের ধারণায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত। নবীন দেশগুলির অনেক নেতাই বোঝেন যে এইসব দেশের বিকাশের পক্ষে কেবল জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সামাজিক-শ্রেণীগত পরিবর্তন: শ্রমিক শ্রেণী, বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, লক্ষ লক্ষ লোকের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন, তাদের সচ্ছলতা বর্ধন, জাতীয় আয়ের ন্যায্য বণ্টন।

তৃতীয় পথের পক্ষপাতীরা সাধারণত এইসব সমস্যার সমাধান দেখেন প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ ও চর্চায়। ফলে এই দাঁড়ায় যে বিকাশের আধুনিক সমস্যার সমাধান তাঁরা করতে চাইছেন সেকেলে হয়ে পড়া পদ্ধতিতে। এটা যে ইওরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে প্রচলিত সংস্কারবাদের প্রকারভেদ, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির স্বাতন্ত্র্যের নজিরটা হয় তার আড়াল। এটা বৈশিষ্ট্যসূচক যে তৃতীয় পথের পক্ষপাতীরা অনেককিছু ধার নিয়েছেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির নীতিগত দলিল থেকে।

তবে কোথা থেকে কী ধার নেওয়া হল সেটা প্রধান কথা নয়। জাতীয় সমাজতন্ত্রের আড়ালে যদি জনগণের বৈষয়িক অবস্থা অবনত হয়, একচেটিয়াগুলির লুটপাট বাড়ে, অসাম্য বৃদ্ধি পায়, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হতে থাকে প্রসারিত, তাহলে তৃতীয় পথের সুনির্দিষ্ট এক-একটা প্রকারভেদের প্রকৃত মর্মার্থ মূলত জনবিরোধী।

মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ যদি বজায় থাকে, ব্যক্তিগত মালিকানা যদি থেকেই যায় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে, আর বহির্নীতি নির্ভর করে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থার ওপর তাহলে সে আবার কিসের সমাজতন্ত্র। সমতা, সামাজিক ন্যায় আর স্বাধীনতার সিধে রাস্তা থেকে এ পথ বহু দূরে।

জাতীয় সমাজতন্ত্রের কথাটা একদল কাজে লাগায় নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে জাহির করার জন্য, অন্যদল

তাতে করে প্রকাশ করে সমতা ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট শর্ত সম্পর্কে নিজেদের বোধ। এইসব ধারার বাস্তব সারার্থ ও শ্রেণীগত প্রেরণা বিচার করেই কমিউনিস্টরা স্থির করে তার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক। জাতীয় সমস্যার সত্যকার বৈশিষ্ট্য যদি তুলে ধরা হয়, স্থানীয় দিকগুলি যদি বিবেচিত হয়, সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যদি প্রতিপাদিত হয়, তাহলে এরূপ ধারাকে সমর্থন করে কমিউনিস্টরা। কিন্তু স্বকীয়তার যুক্তিটা যদি কাজে লাগে জাতিবাদ, বর্ণবাদের সমর্থনে, চিরাচরিত কাঠামোর প্রতিপাদনে, তাহলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তার সমালোচনার মনোভাব গ্রহণ করে। কেননা সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল সবকিছু সংহতির ভিত্তি।

নবীন রাষ্ট্রগুলির বিকাশের পথ সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কী মত?

কার্মসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে ভবিষ্যদগর্ভ হল সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ। কী তার মূলকথা? ব্যাপক শ্রমিক শ্রেণী, দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবীদের ক্রমশ সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। পরিণামে সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশ চালিত ন্যায়, সমতা, যৌথতার নীতিতে জীবনের বৈষয়িক ও আত্মিক সমস্ত দিকের পুনর্গঠনে।

উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আপাতত সমাজতন্ত্রে দ্রুত উত্তরণের পূর্বশর্ত নেই। পাততে হবে দেশের শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি, গড়তে হবে

আধুনিক সামাজিক কাঠামো, শ্রমিক শ্রেণী, দেশহিতব্রতী বুদ্ধিজীবীদের। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সমান্তরালে চলা উচিত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পুনর্গঠন: নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনগণের সংস্কৃতি বর্ধন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথে অর্জিত হয় কেবল রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক মুক্তিও. তাতে দেশের মূলাংশ — কৃষক, শ্রমিক, কারুজীবী, দেশপ্রেমিক পেটি বুর্জোয়া আর বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ মেটে।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে অগ্রগতি নির্ধারিত হয় প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং একসারি সুস্থায়ী ও সাময়িক ব্যাপার দিয়ে। সমাজতন্ত্রে যাবার পথ নিয়েছে যেসব দেশ, তাদের পলিসির ওপর প্রভাব ফেলে অর্থনৈতিক বিকাশের আসল মান, সামাজিক সম্পর্কে কৌলিক-উপজাতীয়, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলির বাস্তব অনুপাত, নেতৃমণ্ডলীর রাজনৈতিক লাইনের বৈশিষ্ট্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট দেশটির অবস্থা। পুঁজিতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট দেশটির সম্পর্ক বাস্তবে কিভাবে গড়ে উঠছে তার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে উদ্ভূত দুরূহতা আর বিরোধাদির প্রকৃতি, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে এগুবার সুসঙ্গতি।

৩। সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য

সমাজতন্ত্রের দিকে এগুবার রূপ আর গতিবেগে প্রতিটি দেশেরই থাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সেইসঙ্গে এইসব দেশের সামাজিক পলিসির প্রধান ধারাটা একইরকম।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ নিয়েছে এমন সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষেই কী বাধ্যতামূলক?

তৃতীয় অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে যে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হল উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা, আর সামাজিক ভিত্তি — অধিবাসীদের সমস্ত স্তরের মৌলিক স্বার্থের ঐক্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ বিলুপ্ত, রাষ্ট্র কাজ চালায় একমাত্র মেহনতিদের স্বার্থে। গড়া হয় নতুন ধরনের গণতন্ত্র: প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের ক্ষমতা এবং জনগণেরই জন্য, সমাজের সমস্ত স্তরের সংস্কৃতি উন্নত হয়।

এই লক্ষ্য সাধনের প্রয়াসে রাষ্ট্র কমবেশি শীঘ্র বা বিলম্বে উৎপাদনের বড়ো বড়ো উপায়ের জাতীয়করণ, কারুজীবী, কৃষকদের সমবায় গঠন, গণ শিক্ষা, অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ নিয়েছে যে রাষ্ট্র, তার রাজনীতি চলে মেহনতিদের স্বার্থে, বর্তমানে তাদের অবস্থা উন্নয়ন আর ভবিষ্যতে তাদের সমূহ শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

এইসব রাষ্ট্রের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অবিলম্বেই প্রকাশ

পাবে, এমন নয়। কিছু কিছু রাষ্ট্রে মেহনতিদের অবস্থা এখনো আধুনিক মানের দাবি মেটায় না। তার কারণ যেমন সমাজের বৈষয়িক-অর্থনৈতিক ভিত্তির দুর্বলতা, তেমনি ভেতরকার প্রতিবিপ্লব আর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানে, অর্থবিনিয়োগের, উৎস সন্ধানে খুবই মুশকিলে পড়তে হয় অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশকে।

সমাজতন্ত্রের পথে এইসব মুশকিলের দরুন প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের বৈষয়িক ও আত্মিক পূর্বশর্ত যথেষ্ট না থাকলেও কাজটা হাতে নেওয়া কি কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয়? সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে এমন বহু দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠা যায় কেবল সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে। এ পথ যারা নিয়েছে, তেমন জনগোষ্ঠীর মুশকিল হয় প্রচুর, কিন্তু তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনায় বিশ্বাস না রাখার কোনো ভিত্তি নেই। পুরো একসারি দেশে সমাজতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বাস্তবতা, পরিণত হয়েছে একটা পরাক্রান্ত বিশ্ব ব্যবস্থায়। আর সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রভাব হয়ে উঠছে যত প্রবল, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে ততই দৃঢ়সংকল্পে, নির্ভয়ে। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশে থেকে থেকেই যে বিপর্যয় ঘটছে, তাতে পশ্চিম বুঝি শ্রেষ্ঠ, অগ্রবর্তী সবকিছুর প্রতিমূর্তি, টুটে যাচ্ছে এই

অতিকথা। এ অতিকথাটা ছড়ানো হয়েছিল উপনিবেশে আধিপত্যের সময়, নিপীড়িত জনগণের আত্মিক গোলামির উদ্দেশ্যে।

বাস্তব সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির রাজপথে উঠে আসা, সমতা আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, অল্পাংশের দৌলৎ আর অধিকাংশের দারিদ্র্যের মধ্যে বৈষম্য কাটিয়ে ওঠা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে সম্ভব। অর্থনীতির দিক দিয়ে বিকশিত, ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ার জন্য নবীন রাষ্ট্রগুলির প্রয়াস সুদৃঢ় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে নানাবিধ সাহায্য পাবার সুযোগে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের কল্যাণে সদোমুক্ত দেশগুলির ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিপদ্ কমে আসছে অনেক। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনী প্রয়াস সংযত রাখার প্রধান কারিকা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সমস্ত দেশের সঙ্গেই সমাধিকার ও পারস্পরিক লাভের সম্পর্ক স্থাপন করছে। এ নীতির শুভ প্রভাব পড়ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রিয়াকলাপে: সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ প্রসারিত করে বৈদেশিক পুঁজির নিকট অধীনতা দুর্বল করে দেবার পথ গ্রহণের সুযোগ থাকছে।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলেছে প্রায় গোটা বিশেক রাষ্ট্র। তাদের নেতাদের সামনে কর্তব্যটা জটিল: প্রতিটি দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতির হিশেব নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক-

অর্থনৈতিক প্রশ্নে সুষ্ঠু, সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাপক মেহনতি জনগণের সামাজিক সক্রিয়তা বর্ধন, পরিচালনায়, নতুন সমাজ নির্মাণে তাদের আকর্ষণকে নিপুণভাবে মেলানো আবশ্যক।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ-নেওয়া রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিতে প্রধান কথা এবং বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ধ্বসিয়ে দেওয়া; রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সেক্টর গড়া এবং তার বিকাশে প্রাধান্য; ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক সেক্টরের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং পরে তার সংকোচন তথা বৈদেশিক পুঁজির জাতীয়করণ বা তার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন; অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশে উত্তরণ; জনগণের স্বার্থে সামাজিক পুনর্গঠন (কৃষি সংস্কার, সামাজিক বিশেষাধিকারের উচ্ছেদ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর অধিকারের অসাম্য বিলোপ, প্রগতিশীল সামাজিক ও শ্রম আইন পাশ, ইত্যাদি), বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগে উত্তরণ; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার বিকাশ। কোনো কোনো দেশে জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়েছে, কোথাও অনুসৃত হয়েছে এই নীতি: 'চাষ করে যে, জমির মালিক সে', সীমিত করা হয় বড়ো ভূস্বামীদের জমির পরিমাণ, অতিরিক্তটা বণ্টিত হয় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে।

ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় সমবায়, বিশেষ করে

কৃষিতে, প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক আর সামাজিক উভয় কর্তব্য সাধনেই সাহায্য হয় তাতে। সমবায়ে মিলিত হয় কৃষকদের শ্রম, এবং তাকে করে তোলা যায় বেশি উৎপাদনশীল। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের অনুপ্রবেশের বিপদ কমে সমবায়ের বিকাশে, শ্রমে, জীবনযাত্রায় যৌথতার নীতি জন্মলাভ করে ও সংহত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা কৃষক গোষ্ঠী সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে যায়।

সমবায়বদ্ধতায় কৃষকেরা আপনা থেকেই সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি এসে পড়ে না। ব্যাপক নিরক্ষরতা, আদিম ধরনের শ্রমের হাতিয়ার, উপজাতীয় কুসংস্কার, যুগ যুগ ধরে লালিত দাস্য মনোবৃত্তি — অতীতের এইসব দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্তি পেতে হয় সমাজতান্ত্রিক বিকাশের গতিপথে। কৃষকদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ছাড়া সামাজিক সক্রিয়তার ব্যাপক জোয়ার, পরিচালনায় কৃষকদের আকর্ষণ, শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর সংহতি সম্ভব নয়। সমবায়বদ্ধতার সঙ্গে মিলে রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক জীবনের পুনর্গঠন হল গ্রামজীবনে গোটা একটা বিপ্লব। সাধারণত এই বিপ্লব চলে একাধিক পর্যায় নিয়ে। তা ছাড়া হয় না, কেননা ইতিহাসের দিক থেকে সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে জীবনের প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থা থেকে কৃষকদের চলে আসতে হবে সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি। জটিলতা আরো বাড়ে এইজন্য যে গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধ না জেগে পারে না, বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে

ধনী দরিদ্রে গ্রামবাসীদের স্তরভেদ হতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে পুনর্গঠনের প্রতিরোধকে বিকল করে রাখার নৈপুণ্য থাকা চাই নেতৃবৃন্দের।

তবে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রূপায়ণে কেবল জাতীয়করণ আর সমবায় স্থাপনই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রীয় সেক্টরের বিকাশকে করতে হয় জনগণের, স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থাধীন। রাষ্ট্রীয় সেক্টর যাতে পরিণত না হয় সরকারি চাকুরেদের ভোজনপাত্রে, না দেখা দেয় আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার নতুন স্তর, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সেক্টরের বিকাশের পেছনে নিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্র বর্ধন।

দ্রুত পরিবর্তনের আশা নবীন বিপ্লবীদের মধ্যে যথেষ্ট ছড়ানো একটা 'ব্যাধি'। তা প্রকাশ পায় রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষে কতটা সম্ভব, তার অতিরঞ্জনে। এ ব্যাধির ফলে নেওয়া হয় হন্তদন্ত সিদ্ধান্ত। এতে করে জাতীয়করণ একটা বিচক্ষণ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার আওতায় পড়তে পারে কেবল বৃহৎ নয়, মাঝারি, এমনকি ছোটো ছোটো মালিকেরাও। এই ধরনের চরম পন্থায় সমাজতান্ত্রিক বিকাশ চালিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে, দেখা দেয় অনাস্থার মনোভাব, হতাশা। জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা, রোম্যাণ্টিক সক্রিয়তার স্থলে আসে নৈরাশ্য। তাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ঘটনাধারার আগেভাগে ছোটার অতিবামপন্থী মনোবৃত্তির, ইতিহাসের দিক থেকে আবশ্যিক পর্যায় ডিঙ্গিয়ে যাবার বিরোধী, সাধারণ যেসব গণতান্ত্রিক কর্তব্যের সাধন হল সাম্প্রতিক

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূলকথা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে যাওয়ার পথে নিয়মসঙ্গত উৎক্রমণ পর্যায়, তাকে উপেক্ষা করার বিরোধী।

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ নাকচ করে না। বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি মনে করে যে ঐতিহাসিক একটা পর্বে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশে, শিল্প ও কৃষির একসারি পণ্যের চাহিদা মেটানোয়, জীবনযাত্রার সেবা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা পলন করবে ব্যক্তিগত জাতীয় পুঁজি। কিছু একটা পর্ব ধরে মিশ্র অর্থনীতি উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে অপরিহার্য এবং তার বৈশিষ্ট্যসূচক।

মিশ্র অর্থনীতির একটা ধরন হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র: ব্যক্তিগত উদ্যোগ তাতে কাজ চালায় রাষ্ট্রীয় সংস্থার অংশ গ্রহণে বা নিয়ন্ত্রণে। তৈল, হীরক, বিরল ধাতু আহরণের ক্ষেত্রে গড়া হয় রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত উদ্যোগ। এই ধরনের উদ্যোগে রাষ্ট্রের হিসসা বাড়তে থাকে, ফলে শক্তিশালী হয় রাষ্ট্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল ভিত্তি, মেহনতিদের জীবন যাত্রার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান বাড়াবার সুযোগ বাড়ে। উৎপাদনী শক্তি বিকশিত হতে থাকে অনেক সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে, তাতে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপ লাভের বৈষয়িক পূর্বশর্ত।

সমাজতন্ত্রের পথগ্রাহী রাষ্ট্রের পার্থক্যসূচক দিক হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, উপনিবেশবাদ আর বর্ণবাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়ার অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য সঙ্গতিনিষ্ঠ ও একাগ্র সংগ্রাম হল সামাজিক পুনর্গঠনের মূল শর্ত। স্বাধীন নবীন রাষ্ট্রগুলি বিকশিত করছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সমাধিকার, অন্যান্য দেশের সঙ্গে পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। সদর্থক নিরপেক্ষতা, সার্বত্রিক শান্তি সংহতির পক্ষপাতী তারা। জোটবহির্ভূতি আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য তাদের বৈশিষ্ট্য। তবে এ আন্দোলনের অভ্যন্তরে আছে নানা ধারা; এমন রাষ্ট্র আছে যারা সঙ্গতিশীলতার সঙ্গে সক্রিয় নির্জোট নীতি অনুসরণ করে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে তারা সচেষ্ট। আবার এমন রাষ্ট্রও আছে যারা পুঁজিতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক, দুই ধরনের দেশ থেকেই সমান দূরত্ব বজায় রাখার প্রলোভনে পড়ে, দুই অধিশক্তি, 'ধনী' ও 'দারিদ্রে' বিশ্ব ভাগাভাগির 'তত্ত্বে' তারা বিশ্বাসী।

৪। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা

যেসব রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলেছে, তাদের দুই রূপে ভাগ করা যায় — জাতীয়-গণতান্ত্রিক আর জন-গণতান্ত্রিক। শেষেরটির বৈশিষ্ট্য হল — রাষ্ট্রক্ষমতা মেহনতিদের মূল স্তরগুলির স্বার্থবাহক, পুঁজিতন্ত্রবিরোধী পুনর্গঠন চালায়,

বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির গুরুত্ব সেখানে নির্ধারক, রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক জনগণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় গঠনও ক্রমশ পুনর্গঠিত হচ্ছে এইসব প্রক্রিয়ার প্রভাবে: প্রসারিত হচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাদির আলোচনায় সামাজিক সংগঠনগুলির অংশগ্রহণ, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক পথগামী সমস্ত রাষ্ট্রেই উচ্ছেদ হয়েছে ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসনব্যবস্থার, রাজতন্ত্রের যেখানে তা বজায় ছিল, সর্দারদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা। রাষ্ট্রিক জীবনে ক্রমশ প্রবর্তিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নির্বাচনাধীনতা, তাতে মেহনতিদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব। মণ্ডলী দ্বারা প্রশাসন, নির্বাচকদের আস্থার অযোগ্য প্রমাণিত হলে প্রতিনিধি প্রত্যাহারের গণতান্ত্রিক নীতি। পার্লামেণ্টী পেশাদারির যে ব্যবস্থায় লোকসভা সদস্যরা রাষ্ট্রযন্ত্রেও সক্রিয়, তা বর্জিত হয়েছে এখানে। একসারি দেশের আইনসভা নিজের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাখ্যামূলক ও সাংগঠনিক কাজ চালাবার নির্দেশ দিয়েছে সদস্যদের যাতে জনগণ জমায়েত হয় গৃহীত সিদ্ধান্ত পূরণের জন্য। বলাই বাহুল্য যে গণতান্ত্রিক এইসব নীতির পূর্ণ রূপায়ণ এখনো দূরের ব্যাপার, কিন্তু প্রথম পদক্ষেপগুলো নেওয়া গেছে।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনপ্রণয়নী সংস্থা — পার্লামেণ্টগুলির সামাজিক সংবিন্যাস উল্লেখযোগ্য। সমাজের সবচেয়ে জনবহুল স্তরগুলির, শ্রমিক, কৃষক, যুবক, নারী প্রতিনিধিত্বের প্রাধান্য সেখানে। কতকগুলি

দেশে রাষ্ট্রপ্রধান হল যৌথ সংস্থা: সভাপতিমণ্ডলী, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, বৈপ্লবিক পরিষদ ইত্যাদি। স্থানীয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাও দেখা দিচ্ছে। কতকগুলি দেশে সম্পত্তি যাচাইয়ের কমিশন, বৈপ্লবিক বিচারসভা, শ্রমিক ও জনগণের স্বেচ্ছাসেবী রক্ষিবাহিনী কাজ চালায় যৌথ নীতিতে।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা তার ক্রিয়াকলাপে ব্যাপকভাবে কাজে লাগায় যাকে বলা হয় সিনক্রেটিক মানাদর্শ, অর্থাৎ এমন নির্দেশনামা যা কেবল আইনি মান নয়, রাজনৈতিক ও নীতিশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তও। সাধারণত এই মানগুলি নিবদ্ধ হয় কর্মসূচিমূলক দলিলে — চার্টারে। চার্টার গৃহীত হয় সর্বত্র অনুষ্ঠিত জনসভায় সর্বজনীন ভোটে। যা অর্জিত হল তার খতিয়ান থাকে তাতে, বিকাশের লক্ষ্য ও কর্তব্য, সমাজজীবনের কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়। পরিচালনায় নাগরিকের অংশ গ্রহণের নীতি সাধারণত বিধিবদ্ধ করা হয় আইন দ্বারা। একসারি দেশে কৃষক সমিতি ও কৃষক মিলিশিয়া বড়ো একটা ভূমিকা নেয় ভূমি বণ্টনে এবং প্রতিবিপ্লবী দঙ্গলগুলির সঙ্গে সংগ্রামে।

এই ধরনের অধিকাংশ দেশে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের মাত্রা বেশ উঁচু। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাই নির্ধারক। সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সাধারণত ওপর থেকে। কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত এজেণ্ট স্থানীয় প্রশাসন আর পার্টি সংগঠন, উভয়েরই কর্তা। এ ব্যবস্থা চলে যেখানে জরুরি পরিস্থিতির প্রয়োজন থাকে। মিশ্র ব্যবস্থাও আছে, সরকারি প্রতিনিধি বহালের প্রথার সঙ্গে মেলানো

হয় স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাকে। রাষ্ট্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা, স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাদির ওপর প্রশাসনিক অভিভাবকত্ব, সামাজিক সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে সাহায্য হয় প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধ দমনে। বহু উন্নয়নশীল দেশে নানা উপজাতির অস্তিত্ব, তাদের মধ্যে অনাত্মীয়তা, অনাস্থা থাকায় দৃষ্টান্তস্বরূপ এশিয়া ও আফ্রিকায় মূলত ঐকিক (ফেডারেটিভ নয়) প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব সঙ্গত হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীকরণকে পরম করে তোলা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের গণতন্ত্রীকরণে বাধা হয় তাতে। এসব পরিস্থিতিতে ঘোষিত গণতন্ত্রের নীতি, যেমন, পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ, পার্লামেণ্টে মেহনতিদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব, বাস্তবে রূপায়িত হয় সঙ্গতির সঙ্গে নয়। এমন দৃষ্টান্ত কম নেই যেখানে নির্বাচিত সংস্থায় কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করে ধনী চাষি বা জমিদাররা।

রাজনৈতিক সম্পর্কের অপরিণত বিকাশ আত্মপ্রকাশ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বলবৎ আইনেও। আইনি মানাদর্শের সুসমন্বিত ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠে নি, যাকে বলা হয় রেওয়াজ, অর্থাৎ উপজাতিদের মধ্যে বহু যুগ ধরে যেসব নিয়মের চল, তার ভূমিকা বিপুল। মামলার বিচার করতে গিয়ে হাকিমেরা উপজাতীয় রীতিনীতি গ্রাহ্য না করে পারে না। কৌলিক-উপজাতীয় সর্দারেরা প্রশাসনিক ক্ষমতা

থেকে বঞ্চিত হলেও জাতভাইদের মধ্যে তাদের প্রভাব বিপুল, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকায়।

ক্ষমতার প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণকে উপলক্ষ করে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা সমাজতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে একনায়কত্বের অভিযোগ আনে, এবং তাদের অনুসৃত নীতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। পাঠকেরা একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন প্রথম অধ্যায়ে। যেকোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই প্রধান প্রশ্ন হল কার স্বার্থ পুষ্ট করছে রাষ্ট্রক্ষমতা। এতে প্রকাশ পাচ্ছে রাষ্ট্রের প্রশ্নে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সর্বাগ্রে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি। নবীন প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলিতে কর্তৃত্বপরায়ণতার উপাদানগুলির সঙ্গে একই সময়ে থাকে গণতন্ত্রের নতুন সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি। কর্তৃত্বপরায়ণতা আর গণতান্ত্রিক নীতিগুলির মিলনে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে নব নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দমনে সাহায্য হয়।

এইসব দেশের রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হল শাসক বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির নেতৃভূমিকা। এই ধরনের পার্টি হল রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র, সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রবাহিনী শক্তি। তারা স্থির করে দেশ বিকাশের প্রেক্ষিত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, আমূল সামাজিক পুনর্গঠনের উদ্যোক্তা তারা। একসারি দেশে এই পার্টিগুলিকে একই সময়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলেও গণ্য করা হয়। কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় পার্টির কংগ্রেসে, কোথাও আবার পার্টি নেতাই

রাষ্ট্রপতি পদের ‘অধিকারী’। স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সেখানকার পার্টি সংগঠনকেই রাষ্ট্রক্ষমতার নিম্নতম সংস্থা বলে ধরা হয়।

বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টি প্রধানত দেখা দিয়েছে সেইসব দেশে যেখানে পুঁজিতন্ত্র বিশেষ বিকশিত হয় নি এবং পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের পটে প্রচার লাভ করে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা। এটা দৈবাৎ নয় যে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টি দেখা দিয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার সেইসব দেশে যেখানে প্রভাবশালী বুর্জোয়া পার্টি ছিল না, যেখানে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত কোনো পার্টি গড়াই প্রায় শুরু হয় নি। প্রায়শই এইসব দেশে অন্যান্য গণ সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, বিভিন্ন ধরনের সমিতিও ছিল না। কয়েকটি দেশে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টি গড়ে উঠতে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বে: তাঙ্গানিকা আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, আঙ্গোলা মুক্তির গণ আন্দোলন, (এম. পি. এল. এ — শ্রম পার্টি), মোজাম্বিক মুক্তি ফ্রণ্ট। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী পার্টির মধ্যে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক অংশটার বিজয়ে গোটা পার্টিটাই রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয় সমাজতন্ত্রমুখিতার জন্য সংগ্রামে অগ্রবাহিনী শক্তিতে।

এই ধরনের পার্টি উদ্ভবের পর তার নেতৃবৃন্দ ক্রমশ পার্টির পংক্তি বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এ প্রশ্নের সমাধানে এগুলো দরকার বিচক্ষণতার সঙ্গে। জোর করে পার্টি সদস্যের

সংখ্যাবর্ধন বা জনগণের সক্রিয়তা, সচেতনতার বৃদ্ধিতে অবিশ্বাস, দুটোই অনুচিত। সদস্য সংখ্যা বেড়ে উঠতে থাকলে অগ্রবাহিনী থেকে পার্টি পরিণত হতে পারে শিথিল সংগঠনের গণ আন্দোলনে। তাই পার্টি-আন্দোলন, পার্টি-ফ্রন্ট যে গড়ে ওঠে সদস্যদের কাছে কড়া দাবির শর্ত নিয়ে অনতিবৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন রূপে, সেটা নিয়মসঙ্গতই। বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সাধারণত নিজস্ব নিয়মাবলি, কর্মসূচি থাকে। তাদের কাজ — মেহনতিদের যৌথ রাজনৈতিক অগ্রবাহিনী হয়ে ওঠা, প্রতিটি মেহনতি সমিতিকে পার্টির প্রভাবে আনা।

বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টিকে প্রায়ই ধরা হয় সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো আর রাষ্ট্রকে তার প্রশাসনিক কাঠামো বলে; সংগঠন হিশেবে পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ রূপ ক্ষমতা, রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নির্বাহক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির বিকাশের পথ নির্ভর করে রাষ্ট্রের বিকাশের ওপর। তাই রাষ্ট্রের মতো বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টিকেও জন-গণতান্ত্রিক আর জাতীয়-গণতান্ত্রিক, মোটের ওপর এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। জন-গণতান্ত্রিক পার্টির বৈশিষ্ট্য হল নিজেদের ভাবাদর্শীয় ভিত্তি হিশেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ, শ্রমিক, কৃষক (গরিব, মাঝারি) সৈনিক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নিজ পঙক্তির পরিপূরণ। পার্টির শুধু নেতৃবৃন্দ নয়, সাধারণ সদস্যরাও যাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলকথাগুলি আয়ত্ত করে, সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা, সংগঠনশীলতা, শৃঙ্খলা,

দায়িত্বের যা দাবি, পার্টির প্রতিটি সভ্য যাতে তা মেটায়, এটা দেখাও গুরুত্বপূর্ণ। এ কর্তব্য সাধনে সূচিত হবে জন-গণতান্ত্রিক পার্টির বিকাশে একটা নতুন পর্যায়। জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টির ভাবাদর্শীয় বনিয়াদ হল সমাজতন্ত্রের অমার্ক্সীয় ধ্যানধারণা। এইসব পার্টির দ্বার সর্বদাই পেটি-বুর্জোয়া স্তরের জন্য উন্মুক্ত। সমাজতন্ত্রের পথ নিয়েছে এমন কিছু দেশে দক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীল পার্টিও আছে। ফলে তীব্র হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম, বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ জটিল হয়।

এসব দেশে সাধারণত একাধিক ট্রেড-ইউনিয়ন তথা কৃষক, যুবক, নারী, ধর্মীয় সংগঠনাদি থাকে না। এইসব সংগঠন আর শাসক বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সামাজিক সংগঠনগুলির পরিচালকেরা কেবল পার্টি সদস্যই নয়, পার্টির নেতৃসংস্থাগুলিরও পদাধিকারী হয়ে থাকে। পার্টি কংগ্রেসে যেসব প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার প্রাথমিক আলোচনায় যোগ দেয় সামাজিক সংগঠনগুলি। কোনো কোনো দেশে প্রশাসনিক ক্ষমতাও ন্যস্ত হয় সামাজিক সংগঠনে। উদ্যোগে ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীদের জন্য বেতনসহ একটা সময় বরাদ্দ হয় ট্রেড-ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপ চালাবার জন্য। সামাজিক সংগঠন, কৃষক সমবায়গুলির সভাপতিরা কিছু কিছু প্রশাসনিক সংস্থায়, সম্পত্তি যাচাইয়ের কমিশনে অন্তর্ভুক্ত হয়। অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকে এইসব কমিশনের। কতকগুলি দেশের ট্রেড

ইউনিয়ন উদ্যোগে শ্রমিক মিলিশিয়া গঠনে অংশ গ্রহণ করে, অর্থনীতির পরিচালনা উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়।

মাঝে মাঝে সামাজিক সংগঠনের নেতৃসংস্থাদিতে ঢুকে পড়ে নৈতিক দিক থেকে অযোগ্য, এমনকি সমাজতান্ত্রিক বিকাশের গোপন শত্রুরাও। মেহনতিদের রাজনৈতিক কৃষ্টি বিশেষ উন্নত না থাকলে এধরনের ঘটনা বিপজ্জনক। এটাই সামাজিক সংগঠনাদির পরিচালনায় কেন্দ্রিক নীতি অনুসরণের আংশিক কারণ। যেমন, রাষ্ট্রপতির আদেশে কোনো কোনো সংগঠন ভেঙে দেওয়া হয়, বদলানো হয় পরিচালকদের। সাধারণত সমস্ত সামাজিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপই রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত হওয়া চাই। যেসব সংগঠন রাজনৈতিক বলে গণ্য তা গঠিত হয় কেবল পার্টির নেতৃসংস্থা, রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তক্রমে। কিছু কিছু দেশে সামাজিক সংগঠনগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক রিপোর্ট দেয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মূলাঙ্গ হল জাতীয় (জন, পিতৃভূমি) ফ্রন্ট — বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত প্রগতিশীল সংগঠনের জোট। জাতীয় ফ্রন্ট লিপ্ত সাধারণ জাতীয় কর্তব্য সাধনে: স্বাধীনতার সংহতি, আগ্রাসন, প্রতিবিপ্লবে প্রতিঘাত, অর্থনীতি, সংস্কৃতির বিকাশ। এই ধরনের সাধারণ জাতীয় সংগঠনে রাজনৈতিক অবস্থা সুস্থির হয়ে ওঠে। তবে সমস্ত দেশেই তার প্রভাব যে বেশ প্রবল, এমন নয়। জাতীয় ফ্রন্টের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে বাধা ঘটে জনগণের

সামাজিক সক্রিয়তার মূল্য ছোটো করে দেখায়, সহযোগী পার্টিগুলির প্রতি অবিশ্বাসে, শাসক পার্টির সংস্থাকে ফ্রন্ট সংস্থার স্থলাভিষিক্ত করায়। এইসব ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা যাবে যতই সমাজজীবনে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মান প্রবর্তিত হবে।

৫। পুঁজিতন্ত্রমুখী দেশ

যেসব উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, শ্রম সংগঠনের সাধারণ রূপ, যেখানে প্রভুত্বকারী শ্রেণী হিশেবে বুর্জোয়া গড়ে উঠেছে বা উঠছে, তারা পুঁজিতন্ত্রমুখী। এইসব রাষ্ট্র সর্বোপায়ে উৎসাহ দেয় ব্যক্তিগত বৃহৎ পুঁজিতে, দেশে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির প্রভাব বৃদ্ধিতে, নিজস্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশে। এসব দেশে রাষ্ট্রীয় সেক্টর থাকলেও তাকে দেখা হয় সহায়ক হিশেবে, ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগের বিকাশে সাহায্য করাই তার কাজ। কোনো কোনো দেশে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পরিণামে দেখা দিয়েছে একচেটিয়া সংঘ যদিও উন্নয়নশীল কোনো দেশেই তারা অর্থনীতিতে আধিপত্যের অবস্থানে নেই।

স্থানীয় বুর্জোয়ার বিকাশের মাত্রা, আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে তাদের যোগাযোগের চরিত্র ও গভীরতা অনুসারে তারা জাতীয় আর বেনিয়ান এই দুই ভাগে বিভক্ত। জাতীয় বুর্জোয়া সাধারণত জাতীয়-মুক্তি

বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে, অর্থাৎ বহিঃশক্তির নিকট অর্থনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে আগ্রহী। বেনিয়ান বুর্জোয়া আন্তর্জাতিক একচেটিয়া, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগে যেতে চেষ্টিত। পুঁজিতন্ত্রমুখী দেশে ভূমি, পশুপালের মালিকদের ভূমিকাও যথেষ্ট। কতকগুলি দেশে তারাই রাষ্ট্রের খুঁটি। রাজনৈতিক জীবনে মেহনতিদের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না, তারা হয় রাজনৈতিক চালবাজি — প্রতারণা, ভীতিপ্রদর্শন, সরাসরি দমননীতির শিকার।

কিছু কিছু পুঁজিতন্ত্রমুখী রাষ্ট্র সংস্কারের প্রবণতা দেখায়, মেহনতি জনগণের স্বার্থ অংশত গণ্য করার পলিসি অনুসরণ করে। তাছাড়া, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা বজায় থাকায় কার্যত সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরই স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়। এই আস্থার চাপে কিছু কিছু রাষ্ট্র এমন সব কাজেরও সিদ্ধান্ত নেয় যা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, যেমন বৈদেশিক একচেটিয়ার জাতীয়করণ।

পুঁজিতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থায় তাদের দশা (বৈদেশিক পুঁজির নিকট প্রচণ্ড অধীনতা, বিপুল বৈদেশিক ঋণ) একই রকম হওয়ার তাদের রাজনৈতিক আর সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারাও হয় একইরকম। প্রথমত, জোর দেওয়া হয় উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্যে সমাজের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীতায়।

দ্বিতীয়ত, সমাজ বুঝি রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ, শ্রেণী বৈর নেই, রাষ্ট্র শ্রেণীর ঊর্ধ্বে ছড়ানো হয় এই অতিকথাটা। তৃতীয়ত, ঐতিহ্যকে মাথায় তোলা হয়, বাড়িয়ে দেখা হয় উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বকীয়তার তাৎপর্য, 'আফ্রিকান', 'আরব-মুসলিম ব্যক্তিত্ব' ইত্যাদির মানসিক-জৈবিক বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলিকে মোটামুটি চারটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা যায়।

প্রথম গ্রুপ। জাতীয় বুর্জোয়া রূপ নিয়েছে, বুর্জোয়ার রাজনৈতিক পার্টি আছে। সেইসঙ্গে থাকছে শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের পার্টি, বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টিও সমগ্রভাবে রাষ্ট্র জাতীয় আর বেনিয়ান বুর্জোয়ার স্বার্থ প্রকাশ করে। এই ধরনের রাষ্ট্র বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অথবা সামরিক একনায়কত্বের রূপ নিতে পারে।

দ্বিতীয় গ্রুপ। রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে বুর্জোয়া আর জমিদারদের একটা ব্লকের হাতে। ব্লকের অভ্যন্তরে শক্তির অনুপাত হতে পারে বিভিন্ন। এইসব রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল দেশের ভেতর যেকোনো রকমের প্রতিবাদ দমনে সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ব্যবহার।

তৃতীয় গ্রুপ। রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়া হয়ে ওঠা সামন্তদের হাতে।

চতুর্থ গ্রুপ। শোষক শ্রেণীরা সবে রূপ নিতে শুরু করেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকা, ওশেনিয়ার দেশগুলি এইরূপ।

পুঁজিতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলির নির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক

বৈশিষ্ট্যে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রজীবনের রূপ প্রভাবিত। এইসব দেশের অধিকাংশই প্রেসিডেণ্টশীর্ষক প্রজাতন্ত্র কিংবা রাজতন্ত্র। আছে পরমরাজতন্ত্রও: আইন-প্রণয়ন, কর্মনির্বাহ, বিচারের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষমতাই ধরে রাষ্ট্রপ্রধান। দ্বৈত রাজতন্ত্রের থাকে দুটি ক্ষমতা: রাজা আর পার্লামেণ্ট। নির্বাচনমূলক রাজতন্ত্রে সর্বোচ্চ শাসক ক্ষমতা পায় সিংহাসনের উত্তরাধিকার বলে নয়, রাজ্য ও এমিরাটগুলির শাসকদের একটি সংকীর্ণ চক্র থেকে নির্বাচনের ফলে। নির্বাচনমূলক রাজতন্ত্রে রাজতান্ত্রিকতার সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিকতা কিছু কিছু মেলে, তবে প্রাধান্য থাকে রাজতান্ত্রিকতারই।

এইসব দেশের অধিকাংশই প্রেসিডেণ্টশীর্ষক প্রজাতন্ত্র। যাদের ভোটাধিকার আছে,তারা নির্বাচন করে প্রেসিডেণ্ট। সমস্ত দেশেই প্রেসিডেণ্টের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতির মাত্রা খুবই বেশি। প্রায়ই প্রেসিডেণ্টকে নিয়োগ করে সামরিক কু'দেতায় ক্ষমতায় আসা সামরিক জাণ্টা। সমাজতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলি থেকে এদের পার্থক্য এই যে পরিচালনায় জনগণকে টেনে আনা, তাদের সক্রিয়তা বর্ধনের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান এখানে থাকে না।

উন্নয়নশীল দেশে ফেডারেটিভ রাষ্ট্রের পক্ষে শিকড় গাড়া কঠিন। যেসব ফেডারেশন আছে, তা উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের ফেডারেশন থেকে বেশ পৃথক। যেমন, সাধারণত অঙ্গরাজ্য, প্রদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে ফেডারেল ক্ষমতার। ফেডারেল ক্ষমতার হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতির নানা কারণ আছে। যেমন

লাতিন আমেরিকায় রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি বহুপরিমাণে সামরিক-একনায়কী প্রভুত্বের সঙ্গে জড়িত। আফ্রিকা এবং এশিয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি হল বিচ্ছিন্নতা প্রবণতার বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিক্রিয়া।

পুঁজিতন্ত্রমুখী অধিকাংশ দেশেই ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কর্তৃত্বপরায়ণ আমলের সাহায্যে। যেসব রাষ্ট্রে সামন্তদের, জমিদারদের প্রতাপ এখনো প্রবল, তাদের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্র বেশি বৈশিষ্ট্য-সূচক। এগুলিতে রাজনৈতিক অধিনায়ক হল প্রেসিডেণ্ট, রাজা। মাঝে মাঝে প্রেসিডেণ্টশীর্ষ প্রজাতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের মধ্যে তফাৎ করা কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা প্রেসিডেণ্টকে কোথাও কোথাও যাবজ্জীবনের মতো রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা আর রাজার ক্ষমতা একই দাঁড়ায়।

পুঁজিতন্ত্রমুখী বেশকিছু রাষ্ট্রে বিরোধী পার্টির ক্রিয়াকলাপ বেআইনি। তথাকথিত প্রেসিডেণ্টের অভিভাবকত্ব নীতি অনুসারে বিদ্যমান পার্টিগুলির ওপর থাকে প্রেসিডেণ্টের নিয়ন্ত্রণ। একসারি দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার প্রেসিডেণ্টের বিশেষ আজ্ঞায় নিষিদ্ধ আর বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্য হওয়া আইনত দণ্ডনীয়। রাষ্ট্র আর পার্টি যন্ত্র এখানে জুড়ে যায়। কর্তৃত্বপরায়ন আমলে প্রেসিডেণ্ট শুধু রাষ্ট্র আর পার্টিরই প্রধান নয়, একইসঙ্গে প্রায়ই প্রধান মন্ত্রী, গুরুত্বপূর্ণ নানা মন্ত্রকের পরিচালক, তাঁকে ঘোষণা করা হয় জাতির পিতা, জাতীয় ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা। প্রেসিডেণ্টে মহত্ত্বারোপ চলে প্রায়ই

9*

কৌলিক-উপজাতীয় পদ্ধতি ও ক্ষমতা প্রতীক মারফত। এমনসব খেতাব দেওয়ার হয় তাঁদের যাতে প্রেসিডেণ্ট থেকে বিচ্ছুরিত হয় অপাপবিদ্ধতার, দেবত্বের জ্যোতি।

কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনের বিভিন্ন রূপ হল গোষ্ঠীতান্ত্রিক, সর্বগ্রাসী এবং সামরিক রাষ্ট্র। গোষ্ঠীতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই যে দেশ শাসনের সংকীর্ণ চক্রটা গঠিত হয় রাজা, প্রেসিডেণ্ট বা সামন্ত আমির-ওমরার পরিবারভুক্তদের নিয়ে। ছোট এই মহলটার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-স্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় রাজা, প্রধান প্রধান পদে থাকে রাজার আত্মীয়স্বজন। কেবল সেইসব পার্টিই অনুমোদিত যারা আমির-ওমরাদের স্বার্থবাহক। সর্বোচ্চ পার্টি-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা জুড়ে যায় চিরাচরিত সামন্ত, উপজাতীয় অভিজাতদের সঙ্গে।

গোষ্ঠীতন্ত্রের উপাদান সেখানেও থাকে যেখানে প্রেসিডেণ্টের আদেশে উপজাতীয় সর্দাররা নিযুক্ত হয় গ্রাম-প্রধান, আর বড়ো বড়ো উপজাতির সর্দারদের ওপর অর্পিত হয় প্রদেশ সরকারের অধীনে সর্দার পরিষদের নেতৃত্ব এবং স্থানীয় প্রদেশগুলিতে শৃঙখলা রক্ষার দায়িত্ব। একসারি রাষ্ট্রে সর্দারদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব থাকে পার্লামেণ্টে, শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক নেতারাও জন্মসূত্রে অথবা পদপ্রাপ্ত উপজাতিসর্দার। মাঝে মাঝে শুধু আইন-প্রণয়নী সংস্থা নয়, সরকারও গঠিত হয় দেশের উপজাতীয় সংবিন্যাস অনুসারে।

সামরিক আমলের বৈশিষ্ট্য হল ফৌজি মহলের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সামরিক-একনায়কী আমলগুলি সাধারণত নয়া-ফ্যাসিস্টপন্থী। সামরিক একনায়কত্ব প্রায়শই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শাসন আছে অল্প কিছু উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয় বুর্জোয়া এবং বামপন্থী শক্তি প্রবল, এসব দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা সরকারিভাবে ঘোষিত, বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক সমেত একাধিক পার্টি বিদ্যমান। নির্বাচন চলে, পার্লামেণ্ট একমাত্র আইন-প্রণয়নী সংস্থা বলে স্বীকৃত। প্রেসিডেণ্ট, প্রধান মন্ত্রী, পার্লামেণ্ট সদস্যদের অদলবদল হয় নির্বাচন মারফত। বলাই বাহুল্য, এ দেশগুলিতেও ঘোষিত অধিকার মেহনতিরা পূর্ণাকারে কাজে লাগাতে পারে না, তবে কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রের তুলনায় স্বীয় অধিকারের জন্য মেহনতিদের সংগ্রামের সুযোগ এখানে বেশি।

পুঁজিতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রের পক্ষে টিপিক্যাল হল রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পার্টির সীমাবদ্ধ ভূমিকা। প্রধানত তারা ক্ষমতা লাভ এবং তা ধরে রাখার জন্য সংগ্রামের উপায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র, নিজ শ্রেণীর অগ্রণী প্রতিনিধিদের টেনে আনার মধ্যবিন্দু তারা হয়ে ওঠে না। কোনো কোনো দেশে আছে দুই-পার্টি এমনকি বহু-পার্টি ব্যবস্থা। তাহলে রাষ্ট্র অনুসরণ করে কেবল শাসক পার্টির ক্রিয়াকলাপ ও ভাবাদর্শ সমর্থনের পলিসি। অন্যদিকে শাসক

পার্টিও সমর্থন করে রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থাকে। এতে করে পার্টির সংখ্যায় রাষ্ট্রের শ্রেণীগত মর্মার্থ বদলায় না।

অন্যান্য সামাজিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন, নানা ধরনের সমিতি) যদি-বা থাকে, রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না তারা। তার কারণ বর্তমান শ্রেণী বিন্যাসের অবিকশিত মান, নিজেদের একটা জনবহুল সামাজিক সংগঠন রাখাতেও শাসক মহল নিস্পৃহ। রাষ্ট্রীয় সংস্থাদি প্রায়ই হস্তক্ষেপ করে সামাজিক সংগঠনের কাজে। সামাজিক সংগঠনের পরিচালকদের নিয়োগ করার প্রচলন আছে। কোনো দেশে নেতাদের নির্বাচনও হয়, কিন্তু তার ফল রাষ্ট্র ক্ষমতার পছন্দ মতো না হলে নির্বাচন নাকচ হতে পারে। সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা হ্রাসে, তাদের উদ্যোগ সংকোচনে প্রকাশ পাচ্ছে পুঁজিতন্ত্রমুখী সমস্ত রাষ্ট্রের বুর্জোয়া মর্মার্থ।

এইসব দেশে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির আইনি রীতিনীতির প্রভাব খুবই বেশি। কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থাদির ক্রিয়াকলাপ উপজাতীয় ঐতিহ্য, জাতিভেদাত্মক প্রথার জেরে যথেষ্ট প্রভাবিত। এটা কাজে লাগায় চিরাচরিত সুবিধাভোগী স্তরেরা: জাতিভেদের কারণে যোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক পদলাভ এমনকি সাধারণ চাকরিতে ঢোকাও মুশকিল হয়। আর এসব রীতিনীতি টিকে থাকে তা পাকাপোক্ত করা রাষ্ট্রীয় পলিসির দরুন। শাসক মহলের অবস্থানের অস্থায়িত্ব, ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে সংবিধানও প্রায়ই বদলায়, থেকে যায় আইনত ঘোষিত সংবিধান আর তা কার্যত রূপায়ণের মধ্যে ফারাক।

উপসংহার

রাষ্ট্র বিকাশের ভবিষ্যৎ কী? এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর দেয় মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদ। রাষ্ট্র আর থাকবে না যখন তার উদ্ভবের কারণগুলি অন্তর্ধান করবে। এদিকে প্রথম পদক্ষেপ হল সমাজতন্ত্র নির্মাণ: বিলুপ্ত হচ্ছে শ্রেণী বৈর, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমতা, যৌথতার সম্পর্ক। অন্য শ্রেণীর প্রভুত্বের স্বার্থে কোনো একটা শ্রেণীকে দমন করার কর্তব্য নেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র দাঁড়ায় সর্বজনীন সমর্থনের ওপর, তার সামাজিক ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে একই রকম সম্পর্কে, মৌলিক স্বার্থে মিলিত, সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের জোট।

সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য — গণতন্ত্রের ব্যাপক বিকাশ।

ক্রমেই পূর্ণাকারে সমাজতান্ত্রিক আত্মপরিচালনার নীতি রূপায়ণে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সচেষ্ট, অর্থাৎ পরিচালনা যাতে চলে কেবল মেহনতিদের স্বার্থেই নয়, তদুপরি নিয়মসঙ্গতভাবে, ক্রমাগত তা যেন হয়ে দাঁড়ায় খোদ মেহনতিদেরই সরাসরি নিজেদের কাজ, লেনিনের কথায় 'যা তাদের নিজস্ব সমিতি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতা' (উপরিস্থিত) জানে না।*

সমাজতান্ত্রিক আইনভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সমাপ্তি ঘটে সোভিয়েত সমাজের গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া দ্বারা। এর সারকথা — আইনের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করা। উনিশ সারা ইউনিয়ন পার্টি সম্মেলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 'সোভিয়েত সমাজের গণতান্ত্রিকরণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গ'-এ সজোরে বলা হয়েছে, কর্তব্য হল এই যাতে সবকিছুর মীমাংসা ঘটতে পারে জনগণ দ্বারা, তার প্রতিনিধিদের দ্বারা, তার নিয়ন্ত্রণাধীনে।

---

* See: V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 25, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 437.

ব্যবহৃত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত অর্থ

আগ্রাসন — অন্য রাষ্ট্রের ভূখন্ড দখল, জনগণকে দাসত্বে বাঁধা, দেশকে আগ্রাসক রাষ্ট্রের অধীন করার জন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদের পলিসি।

একনায়ক — সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, সেই এক ব্যক্তিই শাসন চালায়। সাধারণত একনায়ক ক্ষমতায় আসে সামরিক কু'দেতার ফলে।

একনায়কত্ব — ১) একনায়কের ক্ষমতা ২) কোনো একটা শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য।

একনায়কত্ব, প্রলেতারীয় — সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য বুর্জোয়ার ওপর শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য, প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে শোষকদের প্রতিরোধ দমনের উদ্দেশ্যে, এর চরিত্র সাময়িক, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের রাষ্ট্র এটি। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র পরিণত হয় সর্বজনীন রাষ্ট্রে।

একনায়কত্ব, বুর্জোয়া — মেহনতিদের ওপর বুর্জোয়া শ্রেণীর (পুঁজিপতিদের) রাজনৈতিক আধিপত্য, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত রাষ্ট্রের মর্মার্থ।

ঔপনিবেশিকতা, উপনিবেশবাদ — উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ (প্রভু দেশ) কর্তৃক উপনিবেশের জনগণকে রাজনৈতিক অধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণে নিপতিত করা। বিশ শতকের ৭০-এর দশকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন হয়।

কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মপরিচালনা — কমিউনিজমে সমাজ

চালাবার সংগঠন, অরাষ্ট্রিক পরিচালনা, এতে পরিচালনায় অংশগ্রহণ হয়ে দাঁড়ায় সমাজের প্রতিটি সদস্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা, স্বীকৃত আবশ্যিকতা।

কেন্দ্রিকতা — পরিচালনা ও সংগঠনের যে ব্যবস্থায় স্থানীয় সংস্থাগুলি ক্ষমতার ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীন।

গণতন্ত্র — রাষ্ট্র এবং গোটা রাজনৈতিক জীবনের রূপ। রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক রূপ এবং নাগরিকদের সমতার সরকারি স্বীকৃতি তার বৈশিষ্ট্য। তবে 'বিশুদ্ধ', সাধারণ কোনো গণতন্ত্র হয় না। গণতন্ত্রের মূর্ত-নির্দিষ্ট তাৎপর্য নির্ধারিত হয় সর্বাগ্রে সমাজব্যবস্থার চরিত্র দিয়ে।

গণতন্ত্র, বুর্জোয়া — বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রভুত্বের একটা রূপ। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন এবং আইনের কাছে সকলের সমতা ঘোষণার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। তবে কার্যক্ষেত্রে মালিক আর মজুরি-খাটা শ্রমিক, ধনী আর দরিদ্র, পুরুষ আর নারীর মধ্যে অসাম্য, বর্ণগত, জাতিগত বৈষম্য থেকে যায়।

গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক — সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক জীবনের রূপ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ — ব্যাপক মেহনতী জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ, পরিচালনায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ সহ ক্ষমতা ব্যবহার, সমাধিকার ও স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ, ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার, কার্যক্ষেত্রে তা ভোগের ব্যবস্থা দিয়ে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার সমৃদ্ধি।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা — সমাজতান্ত্রিক সমাজে শাসন ও সংগঠনের নীতি। তাতে অধিকাংশের নিকট অল্পাংশের অধীনতা, একক পরিচালক কেন্দ্র ও শৃঙ্খলা মেনে সমস্ত যৌথ ও গ্রুপের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ ও উদ্যোগের

সঙ্গে পরিচালক সংস্থাগুলির নির্বাচনাধীনতাকে মেলানো হয়। যে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় স্থানীয় স্বাধীনতার স্থান নেই আর যে নৈরাজ্যবাদে রাষ্ট্র, একক পরিচালক কেন্দ্রের প্রয়োজন অস্বীকৃত উভয়েরই তা বিরোধী।

গোষ্ঠীতন্ত্র (অলিগার্কি) — মুষ্টিমেয় ধনী, অভিজাতদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব।

জাতীয় বুর্জোয়া — উন্নয়নশীল দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ যারা স্বদেশের স্বাধীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে আগ্রহী। যেসব মালিক পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়াগুলির মধ্যস্থতার ভূমিকা নেয়, নয়া-ঔপনিবেশিক পলিসির সহায়ক, তারা এই দলে পড়ে না।

ডেপুটি — রাষ্ট্রীয় শাসন সংস্থায় অধিবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সোভিয়েত ইউনিয়নে মেহনতিরা ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েত, স্থানীয় সোভিয়েতে ডেপুটি নির্বাচন করে।

নয়া-ঔপনিবেশিকতা — নতুন পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক পলিসির প্রলম্বন। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির নিকট প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক অধীনতা বজায় রাখা এবং সম্ভব হলে রাজনৈতিক পরাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য।

পুঁজিতন্ত্র — যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়ারা উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের মালিক, উৎপাদন চলে মজুরি-শ্রম শোষণ করে।

পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া — কনসার্ণ, কর্পোরেশন ইত্যাদিতে পুঁজিপতিদের প্রতাপশালী জোট। পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে একচেটিয়ার প্রভুত্ব, সরকারি সংস্থাদির ওপর তাদের নির্ধারক প্রভাব হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

প্রজাতন্ত্র — যে রূপের রাষ্ট্রে ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা গঠিত হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য সংবিধান নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। রাজতন্ত্রের তুলনায় প্রজাতন্ত্র ইতিহাসের দিক থেকে প্রগতিশীল রূপের রাষ্ট্র। তবে প্রজাতন্ত্রের সত্যকার তাৎপর্য নির্ধারিত হয় বিদ্যমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে। তাই সমাজতান্ত্রিক আর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত।

বিকেন্দ্রীকরণ — কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কতকগুলি কাজ স্থানীয় শাসন সংস্থায় অর্পণ করে তাদের অধিকার প্রসার।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের একটি অঙ্গ, সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, ক্রমশ কমিউনিজম নির্মাণের শর্ত ও পথের প্রতিপাদন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — প্রকৃতি, সমাজ, চিন্তন বিকাশের নিয়মাদি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির তন্ত্র, বিশ্বকে জানা ও পুনর্গঠিত করার মতবাদ। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপের ভাবাদর্শীয় বনিয়াদ।

রাজতন্ত্র — শাসনের রূপ, যাতে রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকে একজন ব্যক্তি — জার, রাজা, সম্রাট এবং রাষ্ট্রক্ষমতা সাধারণত হস্তান্তরিত হয় উত্তরাধিকার সূত্রে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা — সমাজের সমস্ত সভ্যের ওপর নির্ধারক নিয়ন্ত্রণ চালাবার সামর্থ্য। সেটা চালানো হয় রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর্তৃত্ব, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অভিপ্রায়, প্রত্যয় উৎপাদন আর বাধ্যকরণ মারফত। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার হল রাষ্ট্র।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া — বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক, জাতীয়-মুক্তিকামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া, জমিদার, অধিপতি শ্রেণীর সমস্ত লোকেদের সক্রিয় প্রতিরোধ, মেহনতিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস আর ব্যাপক বলপ্রয়োগের আমল।

রাষ্ট্রের টাইপ — রাষ্ট্রের শ্রেণীমর্মের ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও পার্থক্য বোঝায় এতে। রাষ্ট্রগুলিকে চারটি মৌলিক টাইপে ভাগ করা হয়েছে: দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক।

শোষণ — উৎপাদনী উপায়ের বৃহৎ ও মাঝারি মালিকগণ কর্তৃক অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করা। উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের বৈশিষ্ট্য।

শ্রেণী সংগ্রাম — বৈরী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীদের মধ্যে সংগ্রাম। উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায় নিজেদের হাতে রাখার, মজুরি-শ্রমের শোষণ বাড়াবার চেষ্টা করে বুর্জোয়ারা। মেহনতিরা বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়ে। পরিণামে শ্রেণী সংগ্রাম পেঁছয় সামাজিক বিপ্লবে।

সমাজতন্ত্র — নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়। সমাজতন্ত্রে থাকে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার আধিপত্য, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ বিলুপ্ত, জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত হয় মেহনতিদের স্বার্থে একক পরিকল্পনা অনুসারে, ক্রমশ গড়ে ওঠে সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজকর্মের সমান পরিস্থিতি।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ। শুরু হয় সমস্ত মেহনতিদের সঙ্গে সহযোগে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ধূলিসাৎ করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়। দেখা দেয় যখন দেশের অভ্যন্তরে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া সংস্থা।

'প্রগতি' প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

ইয়েৰ্মাকোভা আ., রাত্নিকভ ভ.।
'শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম'।
(সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)

এই বইতে জনবোধ্য ধরনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নানা শ্রেণীর উৎপত্তি, আধুনিক সমাজের শ্রেণীজনিত কাঠামোর বৈশিষ্ট্য — সুউন্নত পুঁজিবাদী দেশে, উন্নয়নশীল দেশে ও সমাজতান্ত্রিক দেশে।

শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম কী? শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষ্য কী? সামাজিক বিপ্লব কী? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাঠক বইটিতে খুঁজে পাবেন।

এক বিশেষ অংশে আলোচিত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা, জাতীয় আন্দোলনের কথা।

বইটি ব্যাপক পাঠকবৃন্দের জন্য রচিত।

'প্রগতি' প্রকাশন
প্রকাশিতব্য

বুজুয়েভ ভ., গরোদনভ ভ.।
'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ'।
(সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)

এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রূপে মার্কসবাদ সৃষ্টি হয়েছিল মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে — ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা সাফল্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে। লেনিন এই নতুন তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন। এই বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে তাঁর অবদান এতই বৃহৎ যে বর্তমানে তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নামেই পরিচিত।

লেখকদ্বয় এখানে বর্ণনা করেছেন এই তত্ত্বের উৎপত্তি, মৌলিক নানা উপাদান, তার বিকাশ, তৎসহ বর্তমানে এর তাৎপর্যের কথা।

জনবোধ্য শৈলীতে বইটি লেখা হয়েছে মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের মূলকথা চর্চায় আগ্রহী সবার জন্য।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow Soviet Union

1996

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ·আ·ক·খ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
অর্থশাস্ত্র কী
দর্শন কী
বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
পুঁজিতন্ত্র কী
সমাজতন্ত্র কী বোঝায়
কমিউনিজম কী
শ্রম কী
উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
সম্পত্তি-মালিকানা কী
শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম
পার্টি কী
রাষ্ট্র কী
বিপ্লব কী
উত্তরণ পর্ব কী
মেহনতি মানুষের ক্ষমতা কী
বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী
ব্যক্তিত্ব কী

ISBN 5—01—001406—8